তৃতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

''সময়ের দূরত্বে সাধারণ কথাই রূপকথা হয়ে যায়। জীবনে কেউ তো আর বিশিষ্ট হবার জন্য গুছিয়ে ঘটনা ঘটায় না। বহতা নদীর মতোই জীবনটা নাচতে নাচতে ঢেউ তুলে কালের তীর ধরে কথা-কাহিনী ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যায়। তারপর একদিন সবজীবনই মৃত্যুর মতো এক অনন্ত নিদ্রা বা মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। সেই নিদ্রাসাগরই আমাদের জীবনের মোহনা। কিংবা এই মোহনা থেকেই অনন্ত জন্মের মহাজীবন।''[১] আমরা এই অধ্যায়ে 'সময়'কে চিহ্নিত করব দু'টো দিক থেকে। এক, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবৎকালে বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা, ঘটনা-প্রসঙ্গ উপন্যাসে কতটা ফুটে উঠেছে অর্থাৎ যে সময়ে বর্তমান থেকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। দুই, উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে। ঠিক একই রকম ভাবে লেখকের বাস্তব সমাজব্যবস্থা বা চিত্র এবং উপন্যাসে কাহিনির সমাজব্যবস্থা বা চিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হবে। আর ঐতিহ্য বলতে কোনও বিষয়ের, কোনও অঞ্চলের সময়ের প্রবহমান ধারায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবাহিত হয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তা কীভাবে ফুটে উঠেছে— সেটাও এই অধ্যায়ের আলোচনার অন্বিষ্ট। আমরা আমাদের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস অবলম্বনে উপরিউক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরব।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ যখন সমাজব্যবস্থায় লাগা অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা সামাল দিতে মেয়েরা ক্রমশ বাইরে বেরোতে থাকে চাকরি সূত্রে। অবশ্য এই প্রবণতা উদ্বাস্তু হয়ে আসা শহুরে পরিবারের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। সমাজের এই পরিবর্তন উঠে এসেছে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের সুধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সুধার বড়দি রেখাও চাকরি করে। সুধার ছোট বোন অঞ্জু এখনও পড়াশোনারত। বাঙালি সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আইবুড়ো মেয়েদের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষিত যুবকদের একটা বড় অংশের চাকরি না পাবার তীব্র হতাশাবোধ যা আমরা প্রমথ চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। এমনকি প্রমথ পরবর্তীকালে যাকে বিয়ে করে সেই বীথিও (বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে) একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হয়ে টিউশনি করানোর স্বল্প টাকা থেকে সংসারকে সাহায্য করত ও নিজের বিয়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখত। বীথিকেও আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের

চরিত্র বলতে পারি। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমস্যা সমাজে সৃষ্টি করে প্রেমহীনতা। আর প্রমথ প্রেমহীনতার যেন মূর্ত প্রতীক। সে অনেক মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে জড়ায় কিন্তু কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ভালোবাসার পরিবর্তে পড়ে থাকে কৃতজ্ঞতা যেমন সুধার সঙ্গে প্রমথর সম্পর্ক। কিন্তু সুধা আঁকড়ে ধরতে চায় বারবার প্রমথকে। কেননা তার বিশ্বাস প্রমথর যা রেজাল্ট (এই সম্পর্কে প্রমথর মিথ্যা ভাষণ) তাতে আজ না হয় কাল সে একটা ভালো চাকরি পাবেই। তৎকালীন সমাজ-নির্ধারিত বিবাহ বয়স পার করা ন্যূনতম বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে প্রমথর মত যুবকের স্ত্রী হওয়া সেই সময়ের সুধার মত মেয়েদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। তাই সুধার মত মেয়েরা নাছোড়বান্দা।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বাংলার অস্থির রাজনৈতিক সময়ের ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রমথ-সুধা-বীথি-অবিনাশ প্রমুখের কাহিনির মাঝে মাঝে বিভিন্ন জনের কথাবার্তায় সেই অস্থিরতার ছবি ভেসে উঠেছে। অনেকটা যেন কোনও চরমপন্থী আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন, তারই কিছু টুকরো ছবি—

ক) ''কলকাতা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। এত বড় একটা প্রোসেশন গেল। মনে মনে একটা ঘেন্নার ঢেউ অনেকেই পুষছে। অন্নপূর্ণার সামনের পিচের রাস্তায় দিন দুই লাল লাল দাগ ছিল।''[অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ১৪৪]

খ. ''প্রোসেশনটার পর সবাই ঝিমিয়ে গেছে। কিংবা গুম্ মেরে বসে আছে। কোনো জিনিস কেউ আলোচনা করে না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে খবর বেরোয়, কারা যেন শহিদ বেদী বানাচ্ছে, কারা যেন তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় আছে।''[অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ১৪৪]

এই রকম অস্থির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সময়ের দ্বারা বিদ্ধ প্রমথ— তাই তাকে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের শুরুর আধুনিক যুব সমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র বলা যায়। প্রেমহীন, দ্বিধাগ্রস্ত, কোনও কিছুতে একাগ্র হতে না পারা, সময়-নির্মিত ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকা যুব সমাজের মুখ হয়ে ওঠে প্রমথ। তবুও তার মধ্যে যৌথ পরিবারের প্রতি টান লক্ষ্য করা যায়। সে সময় এই যৌথ পরিবারের ভিত্তিই বেকারত্বের হতাশায় কিছুটা মলম লাগাতে সাহায্য করত। প্রমথের পরিবারেও সেই ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। তৎকালীন শহুর জীবনের এস্টাব্লিশমেন্টের রূপ তুলে ধরেছেন লেখক এই উপন্যাসে। ফলে তৎকালীন সময় ও সমাজের একটি বিষণ্ণ নগ্ন চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের ব্যবহার খুব সহজাত প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাই লেখক প্রমথের প্রেম, চাকরি পাবার চেষ্টা, যৌথ পরিবারের ছবি ইত্যাদির মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের প্রভাব রয়েছে। লেখকের অনেক উপন্যাসেই প্রধান চরিত্রের এক দাদার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানতে পারি। যেমন এই উপন্যাসে প্রমথর সেজদা তনুর মৃত্যু প্রসঙ্গ আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেজদা পূর্ণেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৭ খ্রি: দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয় গোটা পরিবারকে। লেখকের মনে এই ঘটনা এতটা গভীর প্রভাব ফেলে যে, অনেক উপন্যাসেই সেজদার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা-প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন চরিত্রের স্বপ্নের মধ্যেও সেজদার উপস্থিতি দেখা যায়। তবে হয়তো লেখকের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য আছে উপন্যাসে প্রমথ ও বীথির বিয়ের ঘটনার সঙ্গে। সালকিয়ায় ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের (শ্যামলের স্ত্রী) অনেক ভাই বোন নিয়ে নিম্নবিত্ত পরিবার, এক বোন নীতির সঙ্গে লেখক মতি নন্দীর বিয়ে, মতি নন্দীর সঙ্গে শ্যামলের ইতিকে দেখতে আসা, শ্যামলের বাড়ি থেকে পণের দাবি— সেই দাবি না মানতে পারার ফলে বিয়েতে শ্যামলের পরিবারের অসম্মতি, শ্যামলের ইতিকেই বিয়ে করার জেদ, শ্যামলের বাড়ি যাতে বিয়েতে কোনও সমস্যা করতে না পারে— সেজন্য সামাজিকভাবে বিয়ের আগেই শ্যামলের রেজিস্ট্রি করা, ইতির টিউশনি করে টাকা জমানো ইত্যাদি সব ঘটনাই আমরা উপন্যাসের প্রমথ-বীথির সম্পর্কে দেখতে পাই। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''যে সময়টার কথা বলছি, ১৯৫৯-৬০ সাল, কিছুদিন মাত্র হয়েছে, আমার আরেক বোন নীতির সঙ্গে বিয়ে হল মতি নন্দীর।''[২] লেখক মতি নন্দীর ছায়া দেখতে পাই প্রমথর বন্ধু নীতিশের মধ্যে। কারণ নীতিশের শ্যালিকা বীথি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিয়ের পরেই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখায় হাত দেন। ফলে বিবাহ-স্মৃতি যুবক লেখকের মনে তখনও টাটকা যা প্রমথর নপুংসকতার কাহিনির সঙ্গে সহজাতভাবে জোড়া লেগে যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু কোনও একটি সময়ে বসে সময়কে তুলে ধরেননি, নিজের শরীর ও মনে লাগা সময়-প্রভাব সযত্নে শৈল্পিক পদ্ধতিতে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাই এত জীবন্ত, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে সময়ের কথা, সমাজের কথা। লেখক জানাচ্ছেন, ''এক সময় ডেলিপ্যাসেঞ্জারির জীবন, চাকরি খোঁজার জীবন গল্পে চলে আসতে লাগল। চাকুরে মেয়ের গল্প দু'একটা লিখে ফেললাম। সন্ধ্যার মুখে মুখে আগাছা ঢাকা প্রাঙ্গনে সাপখোপ দেখা দিলে আমরা সিওর হওয়ার জন্যে থ্যাঁতা

করে বাঁশের বাড়ি মারি। তাতে নিষ্ঠুরতা এবং নিশ্চয়তা থাকে।”[৩] সময়-সমাজের নিষ্ঠুরতা দেখাতে লেখক কখনও কার্পণ্য করেননি। তাই শ্যামলের উপন্যাসে সময়-সমাজের বিশ্বাসযোগ্য ছবি দেখার নিশ্চয়তা আমরা পাই।

কোনও প্রিয়জনকে দীর্ঘ হাসপাতালে থাকতে দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন লেখক। সেখানেই সে দেখে ‘‘বড় ডাক্তার অপারেশন করতে করতে বাইরে এসে ফোন করছে। গবেষণার জন্য মানুষ আলু-পটলের মত কাটা পড়ছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। মৃত্যুর শত্রু একটি সাদা বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। বই লিখে ফেললাম।”[৪] ডাক্তার, ঔষধ-পত্রের ব্যবসা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামে সাধারণ গরীব মানুষদের গিনিপিগে পরিণত করা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলতে গিয়ে এখনকার সময়কেও যেন লেখক ছুঁয়ে ফেলেন। কারণ আজকের সময়েও এই বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ডাক্তার, ওষুধ, রোগীর বিষয়গুলো যে পরিবারকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে—সেটা হলো লেখকের দাদামশাই অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ও তার দশ কন্যা ও দুই পুত্রের মাধ্যমে। মা কিরণকুমারী গঙ্গোপাধ্যায় ও তার অন্যান্য বোন ও ভাইয়েরা এবং দাদামশাই অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি এই উপন্যাসের শিরদাঁড়া। ‘অনিলের পুতুল’ উপন্যাসে এই দাদামশাইয়ের প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। বিশেষ করে দম্ভ, বড়লোক হবার উচ্চাশা, লোভ, ব্যবসায় বুদ্ধি, অতিরিক্ত কাম, অতিরিক্ত গরিমা প্রকাশ, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, ফোর্থ ক্লাস অসুখ, বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমাহার ইত্যাদি বিষয়ে দাদামশাইয়ের কথা লেখক বারবার এনেছেন। কাহিনিতে দাদামশাইয়ের সশরীরি উপস্থিতি না থাকলেও তার প্রসঙ্গ বারবার এনে দাদামশাইয়ের সময় ও সমাজকে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতির এই দুঁদে সভাপতি নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে লাগলেন আট-ন’বছর বয়সে। গৌরীদানের পুণ্য অর্জন। প্রত্যন্ত গাঁ থেকে দোজবরে ধরে ধরে। যাতে কিনা একশো টাকার ভেতর বিয়ে কমপ্লিট হয়। টাকা জমাচ্ছিলেন তখন। এই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আর আর পরের বছরগুলোয়।”[৫] এই দাদামশাই অবশ্য পণ্ডিত ও সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। সেতার বাজানোর শখ ছিল। প্রায় প্রতি বছরের মাথায় বাবা হতেন। কোম্পানির কাগজ কেনা থেকে সুদে টাকা খাটানো সবই করতেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ আন্দোলনের সময় অসংখ্য বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতি গড়ে ওঠে। যার মাথায় বসত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু তাদের এই বৈষম্যমূলক ভণ্ড আচরণ উনিশ ও বিশ শতকের দীর্ঘ সময়

ধরে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত রাখতে সাহায্য করেছিল। লেখকের মা কিরণকুমারী গঙ্গোপাধ্যায়েরও বাল্যবিবাহ হয়েছিল।

''যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।''[৬]

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দরে'র সূচনায় প্রাচীন যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এভাবেই পরিচয় দিয়েছেন। প্রতাপাদিত্য ছিলেন আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে একজন, বিরাট গুহের বংশধর। বঙ্গদেশের বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম শক্তিশালী সামন্ত রাজা ছিলেন তিনি। তৎকালীন মোঘল রাজত্বের অধীন এক সামন্ত থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজ্যের মহারাজা হিসেবে প্রতাপাদিত্য নিজেকে ঘোষণা করেন। তাঁর রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল বৃহত্তর চব্বিশ পরগণা, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশালকে কেন্দ্র করে। ১৫৯৯ খ্রি. নাগাদ থেকে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি করা, একের পর এক দুর্গ প্রতিষ্ঠা, অসংখ্য রণতরী ও জাহাজ নির্মাণ তাকে মোঘল অধীন এক সামন্ত রাজা থেকে বঙ্গের এক বড় অংশের স্বাধীন শক্তিশালী মহারাজায় পরিণত করে। আর এই কাজে যার অন্যতম ভূমিকা ছিল তিনি হলেন ঢালী সৈন্যের সেনাপতি মদনমল্লের। যার অদম্য সাহস, বৃহৎ কিছু তৈরির পরিকল্পনা-ইচ্ছা, স্বল্পে সন্তুষ্ট না হওয়া এবং ক্রমশ অগ্রসর হবার জেদ প্রতাপাদিত্যকে তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে এই বৃহৎ হিন্দুস্থানের এক সামান্য অংশের অধিপতি হয়েও রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। সেনাপতি মদনমল্লের প্রচণ্ড কর্মস্পৃহা মদনমল্লকে অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে স্থির থাকতে দেয়নি— একের পর এক অঞ্চল সে অধিকার করেছে— সামন্ত রাজার সৈন্যশক্তিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে মহারাজের উপযোগী সৈন্য শক্তিতে পরিণত করেছে। কোনও কাজে নিজের সবকিছু উজার করে দেবার প্রবণতা, অদম্য কর্মস্পৃহা ইত্যাদি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আমরা 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের কুবেরের মধ্যেও

লক্ষ্য করতে পারি। ফলে ষোড়শ শতকের শেষে ও সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকের মদনমল্ল আর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ড্রিম মার্চেন্ট থেকে চকদার হবার স্বপ্নে বিভোর কুবের হয়ে ওঠে যেন আত্মার আত্মীয়। কারণ কুবেরের বিজয়াভিযান শুরু হয়েছিল মাত্র কয়েক কাঠা জমির মালিকানা পাবার পর থেকে, যেমন মদনমল্লের অভিযানও সামান্য পরাধীন এক সামন্ত রাজার অল্পসংখ্যক সেনার সেনাপতি হিসাবে। ফলে উভয়ের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান মুছে গিয়ে মদনমল্ল ও কুবের যেন এক হয়ে যায়। মানসভ্যতার ইতিহাসে এই গোত্রের কতিপয় মানুষ আমাদের প্রথাগত জীবনধারায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। যারা নিশ্চিত পরাজয় জেনেও জীবনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে না। যেমন করেনি মদনমল্ল মোঘল সেনাপতি মানসিংহের বিপুল সেনাবাহিনীর সামনে, যেমন করেনি কুবের মেদনমল্লর চড়ে সর্বস্ব খুইয়ে। এই গোত্রের মানুষেরা যে কালেই যে স্থানেই জন্ম নিক্ না কেন তারা সকলেই তো একগোত্র বা একই বংশের নিকটাত্মীয়। তাই এদের কাছে সময় নেহাতই পুরানো দিনের স্মৃতিমাত্র— সময়ের ধারণা এভাবেই পাল্টে দেন লেখক 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে।

কুবের যে সময় দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে জীবনের পথে চলতে শুরু করে— পৃথিবীটা যেন ধীরে ধীরে সেই সময় থেকেই কঠিন হতে শুরু করেছে। বিয়ের পর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সন্ধিক্ষণের দোলাচলতা কুবেরের মনে সর্বদা বিরাজ করে। তাই যেখানেই সুযোগ মিলেছে অতীত ও বর্তমান সময়ের তুলনা কুবের করেছে। কুবেরের মতে, ''... উনিশ শো ঊনচল্লিশ পর্যন্ত দীর্ঘ এক শো দেড় শো বছর চাকুরেদের সোনার সময় গেছে। খাবার-দাবার, বাড়িভাড়া কাপড়চোপড় সবই সস্তা।''[৭] হাওড়ার লোহার কারখানায় সামান্য চাকরি করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনও দিনই আসবে না, কুবের সেটা বুঝতে পারে। অন্যদিকে কুবেরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা তীব্র কর্মস্পৃহা গুমরে গুমরে মরে। ছোট থেকে বড় করার, নতুন কিছু বানাবার উন্মাদনাই কিছু মানুষকে অন্য অনেক মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে। যে কোনও কালেই এরা নিজেদের জাত চেনাতে পারে। শুধু একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জমি কিনতে গিয়ে অবচেতন মনে কুবের সেটাই অনুভব করেছে। ফলে কুবের ডুবে যেতে থাকে বিষয়ের মধ্যে। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে 'ড্রিম মার্চেন্ট' কুবের। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দ্রুত গতিতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে—এছাড়াও বাংলায় ক্রমশ উদ্বাস্তু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক এই বিষয়ে মাওলা ব্রাদার্স (ঢাকা, বাংলাদেশ) থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত আবু জাফর অনূদিত জয়া চ্যাটার্জীর

'দেশভাগের অর্জন' (বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়াও সুভাষ বিশ্বাসের সোম পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত 'দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা' (২০১৯) পাঠযোগ্য একটি গ্রন্থ। এরফলে জমি কেনাবেঁচা সেই সময় সমাজে একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে। সময়ের এই নাড়ি-স্পন্দন নিখুঁত শিল্পী হিসাবে ধরতে পেরেছিল কুবের। যেমন ধরতে পেরেছিল কুবেরের পাঁচ পুরুষ আগের বংশের সবচেয়ে কৃতী মানুষ বাবু হরিরাম সাধুখাঁ। যারা ধরতে পারে না তাদের অপেক্ষা করতে হয় কলেরায় কত বড়লোক মানুষ ফৌত হবে— তারপর ক্রস বিক্রির কমিশন বাবদ কিছু টাকা হাতে আসবে। এরা (যেমন, কুবেরের বন্ধু সনৎ) এই সময় বেঁচে থাকার জন্য নতুন পথ তো খোঁজে কিন্তু বন্ধ্যাযুক্ত পথ। বেঁচে থাকার তাড়নায় মানবিক বোধগুলো যখন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে— সময় কঠিন হওয়া শুরু তো সেই সময় থেকেই। তাই সনতের কাছে হিউম্যানিটি অপেক্ষা যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থ উপার্জনের জন্যে অনেক বড়লোক মানুষের মৃত্যু কামনাও সনতের কাছে খুবই স্বাভাবিক বিষয়। একদা ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের এই অবস্থা সেই সময়ের সমাজের নগ্ন সত্যকে প্রকাশ করে। ব্রজ ফকির সেসময়ের বেকার কুবেরকে একজন 'কনটেমপোরারি আর্টিস্ট' হিসাবে চিহ্নিত করে। এই অভিধা ব্রজ ফকিরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ যারা সময়কে নিঙড়ে নিয়ে মুহূর্ত ধরে অনুভব করে নিজের বেঁচে থাকার অস্তিত্বকে, যাদের কাছে বেঁচে থাকাটা লড়াইয়ের নামান্তর— তারা তো আসলে প্রত্যেকে শিল্পী। তাই ব্রজ ফকিরকেও এই সময়ের আর্টিস্ট বলা যায়। কারণ রেলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনা উদ্ভাবনী সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচয় দেয়। উপন্যাসের কাহিনিতে তৎকালীন সমাজে জমি ও মন্দির কেন্দ্রিক ব্যবসার অন্যতম সফল দুই কারিগর হলো এই কুবের ও ব্রজ ফকির।

মেদনমল্লের চড়ে এসে কুবের যেমন অনুভব করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে বয়ে চলা প্রচণ্ড কর্মস্পৃহা তেমনি ''এই নিশুতি রাতে অচেনা দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে কুবের বারবার বুঝতে পারছে— এই নদী, এই মাটি— বাতাসের দাপাদাপি, ভগবানের পোকামাকড়— সবকিছুর হাতে সে শুধুই একটা পুতুল। তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কোন রাস্তা নেই।''[৮] আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জগতে মানুষের কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকে না। এতেই গতানুগতিক অর্থহীন জীবন বৈচিত্র্যময় অর্থবহ হয়ে ওঠে। কোনও না কোনও ক্ষেত্রে বা সময়ে তোমার পরাজয় নিশ্চিত, তারপরেও তোমাকে কাজ করে যেতে হবে— এটাই অনিবার্য পরিণতি— যাকে আমরা কর্মস্পৃহা-কর্মউন্মাদনার ঐতিহ্য বলতে পারি। কারণ এই কালপ্রবাহে

একজন মানুষের আয়ু নিমেষমাত্র— তাই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে কতিপয় মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হয়ে মানবসভ্যতার ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এই ঐতিহ্যের কথাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই।

কুবের-স্রষ্টা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কেও এই ঐতিহ্য বহন করতে দেখি। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''যে জীবন সে নিজে যাপন করেনি, যার মধ্যে নিজের উন্মোচন নেই, যে জিনিস তার করতলধৃত আমলকী নয়, সেসব নিয়ে সে লিখবে কেন? তার যে চাই একেবারে জ্যান্ত, টাটকা নিজের অভিজ্ঞতা।''[৯] এই ভাবনার সার্থক প্রতিফলন শ্যামলের উপন্যাসগুলোতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের বারবার ছোটবেলায় ঘটা যে স্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে— যে ঘটনা সর্বদা কুবেরকে একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার চাদর পড়িয়ে রাখে— সেটা আসলে শ্যামলের কৈশোরের খুলনা জেলা স্কুলের ঘটনা। ঘটনার দিন শ্যামলের সহযোগী যে বন্ধু ছিল সেই শরৎ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক বড় কর্তার স্টেনো কাম কনফিডেনসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিল। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক জানায়, ''... সেই দুপুরে মনোদিদির হাত হয়তো খালি ছিল একদম। আমাদের কিলিয়ে খদ্দের পাকিয়ে নিতে হয়েছিল তাকে। নয়তো শুধুই কিশোর-বিলাসের অভিরুচি হয়েছিল তার। কিন্তু রতিবিলাসের পক্ষে আমরা তো তখন নেহাতই কচি।''[১০]

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে লেখক ১৯৫২ খ্রি: 'এসিস্ট্যান্ট মেলটার' হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে বেলুড়ের 'ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টিল' কোম্পানিতে। কোম্পানির এই কাজে আটকে থাকার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। ১৯৫৪-৫৫ খ্রি. নাগাদ জমি সংক্রান্ত বিষয় শ্যামলের নজরে চলে আসে। কোম্পানির কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সুপারিশে প্রুফ রিডার পদে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করেন। কিন্তু কাজ ভালো না লাগায় কিছুদিন পর আবার ইস্তফা। এরপর নানান কাজে যুক্ত হয়েও থিতু হতে না পেরে সন্তোষকুমার ঘোষের আহ্বানে স্থায়ী কর্মী হিসাবে সাব-এডিটর পদে ১৯৬০ খ্রি: পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ওই বছরেই ইতি সান্যালের সঙ্গে বিবাহ। বিয়ের এক বছর পরেই প্রথম সন্তান মলির আগমন এবং তার চার বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান ললির আগমন। আনোয়ার শাহ রোডের বাড়িতে লেখক পুরো পরিবার নিয়ে গাদাগাদি করে বসবাস করেছেন। তারই মধ্যে প্রথম উপন্যাস 'বৃহন্নলা' লেখার কাজ সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'অনিলের পুতুল' লেখেন বউবাজারে ব্যোমকেশ বাবুর প্রেসে।

১৯৬৪ খ্রি. প্রথম চম্পাহাটিতে আসেন জমি দেখার সূত্রে। সেই সময় শ্যামলের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''ক্ষুধার্তের মতো শ্যামল লেখার জায়গা খুঁজছিল একটা। তার সঙ্গে খুঁজছিল লেখার নতুন বিষয়ও। কারণ, এই সময় থেকেই তো ওর মধ্যে একটু একটু করে চাড়িয়ে উঠছিল জমির নেশা। ... লেখার জন্যে স্থানাভাব, সন্তানদের নিয়ে একটু গুছিয়ে থাকা আর জমির নেশায় ১৯৬৫ সালে লক্ষ্মীপুজোর পরদিন আমাদের চম্পাহাটির দিকে রওনা দেওয়া।''[১১] স্থানাভাবের ফলে একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জন্য উপন্যাসে কুবেরও জমি দেখতে শুরু করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে লেখক শ্যামলকে জমি-কৃষি-গ্রাম-গ্রামের মানুষের নেশা পেয়ে বসে। যদিও লেখক চম্পাহাটিতে টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে সপরিবারে আসার প্রায় দেড় বছর পর ১৯৬৭ খ্রি. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটির নিজস্ব বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানসহ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাঝের সময়টিতে এই অঞ্চলেরই দু'টি ভাড়া বাড়িতে তাদের থাকতে হয়েছিল। নিজস্ব বাড়িতে মা কিরণকুমারীকে আনতে পারেননি শ্যামল, ঠিক যেমন উপন্যাসে পারেনি কুবের। লেখকের অনেকটা জায়গা জুড়ে মা কিরণকুমারী ছিলেন— মা'র চলে যাওয়াটা কুবেরের মত শ্যামলের জীবনে বড় একটা বিষাদ-ক্ষত দিয়ে যায়। কিন্তু সময় তো থেমে থাকে না, ততোদিনে শ্যামলের জীবনে সূত্রপাত ঘটে গেছে চম্পাহাটি পর্বের। কো-অপারেটিভ সিস্টেমে জমি কেনা, বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি উপায় বের হতে থাকে শ্যামলের মস্তিষ্ক থেকে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাস রচনার কাঁচা রসদের খাদানে পরিণত হয় 'চম্পাহাটি' অঞ্চল। সেই সময়ের কথা লেখক নিজেই জানান, ''জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্টকাছারি। দলিল দস্তাবেজ। উকিল মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।

আসলে পৃথিবীটা যেমন আছে তেমন থাকে। যুগে যুগে মানুষ এসে দখল দাবি করে। কখনো অর্থবলে— কখনো লোকবলে।

এই ব্যাপারগুলো লেখায় আসতে লাগল।''[১২]

আর 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মেদনমল্লের দ্বীপ প্রসঙ্গে লেখক জানান, 'পাগলা নদী দিয়ে জলপথে গিয়ে একদিন পরিত্যক্ত সুন্দরবনের দ্বীপে মেদনমল্লের দুর্গ দেখলাম দূর থেকে। ছাদ নেই। শ্যাওলামাখা দেওয়াল। বিশাল দিঘি দামে ঢাকা। বাঙালি নৌ-সেনাপতির নৌ-ঘাঁটি। কী করে যেন 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে এসব কথা এসে গেল। ফসলেরও একটা নেশা আছে। সে নেশা আসলে দখলের। আরও কত আমার করায়ত্ত করা যায়।''[১৩] লেখকের 'অল্টার ইগো'

(Alter Ego) হিসাবে উপন্যাসে যেন উপস্থিত হয় কুবের। এই কুবেরকেই লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নাম পাল্টে পাল্টে বিভিন্ন উপন্যাসে হাজির করান। এভাবেই একই ঘটনা-প্রসঙ্গ, বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রও লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

আমরা জানি, চম্পাহাটি পর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আরও তিনটি উপন্যাস লিখেছেন, যথা— 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'চন্দনেশ্বর জংশন' ও 'স্বর্গের আগের স্টেশন'। 'কুবেরের বিষয় আশয়'সহ চারটি উপন্যাসকেই আমরা একটি উপন্যাসের চারটি খণ্ড বা পর্ব সহজেই বলতে পারি। মেদনমল্ল দ্বীপে কুবেরের যে ধান চাষ করার অধ্যায় ছিল সেটাই 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবে এই উপন্যাসে কোনও পরিত্যক্ত দ্বীপের কথা নয়; ঈশ্বরীতলা, মৌজা চন্দনেশ্বর, মৌজা খাড়ুপাতাল, মৌজা দ্বারিকপোতার কৃষকদের জমির যে অংশ জলের অভাবে বছরের একটা দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত হয়ে থাকে সেই সমস্ত জমি ও চাষবাস নিয়ে কথা। সমবায়িক প্রথায় ঐ অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে নায়ক ধানের চাষ শুরু করে। যার নেতৃত্বে অবশ্যই তথাকথিত বেগার শ্রমিক অনাথবন্ধু বসু ওরফে যেন কুবের। ঐ অঞ্চলে দেখেন 'ধানবাড়ি' ও 'আটাবাড়ি' নামক এক ধরনের সুদের প্রথা প্রচলিত আছে। লেখক বলেছেন, ''ধান নিয়ে গাঁয়ের পর গাঁয়ে এক অদ্ভুত সুদের কারবার চলছে। অভাবের দিনে চাষী এক বস্তা ধান ধার নিলে ধান উঠলে দেড় মণ ফেরত দিতে হয়। ঈশ্বরীতলার ভাষায় এ কারবারের নাম ধানবাড়ি। তেমনি মুদিখানাগুলোয় চালু আছে আটাবাড়ি।''[১৪] তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের যে চেহেরা ফুটে উঠেছে, তা হলো গ্রামের পুকুরগুলো সংস্কার করার কথা তাদের মাথায় সেভাবে কোনও দিন আসে না। এই অঞ্চলে পুকুরে মাছ চাষ তেমন জনপ্রিয় নয়। স্নানের জন্যও যে সেভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, তেমন নয়। তাই জলের রঙ সবুজ, জলে পচা গন্ধযুক্ত শ্যাওলা জমে থাকে। কাঁচা বাড়ির ছাউনি হিসাবে গোলপাতা বেশি ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে গাই গরুর একটি সাধারণ রোগ 'এসো'। সংসারের বাতিল বুড়ো বুড়ির জায়গা হয় সাধারণত বাড়ির ঢেঁকিঘরে। ঢেঁকির ব্যবহার এই অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। আবার বিশ্বাস করার মতো মানুষ পেলে তারা যে খুব সহজেই অল্প সময়ে মধ্যে সবকিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে— তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো বহিরাগত অল্প-পরিচিত বা প্রায় অপরিচিত অনাথবন্ধুর মত মানুষ। চার মৌজার কৃষকদের থেকে জমি সংগ্রহ করা— ব্যাংকের লোনের শর্ত পূরণ করার জন্য চাষের আগেই চাষীদের গোলা থেকে এক বস্তা করে ধান পাওয়া— গতর ও মন দিয়ে কৃষকদের সোৎসাহে কাজে নামা ইত্যাদি সেই বিশ্বাসেরই

পরিচয় বহন করে।

এই অঞ্চলের রাজনীতির অন্যতম মুখ রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট জনতার প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তি। ভোটের কাজ, জমিতে নয়া পত্তন দিয়ে প্রজা বসানো ইত্যাদি কাজের জন্যে দক্ষিণা এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত সন্তোষ টাকিকে পোষে। বলপূর্বক পুরানো প্রজাদের উঠিয়ে বেশি দামে নতুন প্রজাপত্তন বাংলায় ষাটের দশকেও প্রচলিত ছিল। এছাড়া তখনও ভূমিসংস্কার, বর্গাদার আইন ইত্যাদি সেভাবে গ্রাম বাংলায় কার্যকর না হবার ফলে জমিদার, জোতদার প্রমুখের প্রভাব সেভাবে কমেনি। ভারতবর্ষে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন আসে ১৯৬৩ খ্রি:। এরপর আসে পশ্চিমবঙ্গে West Bengal Land Reforms Act, 1955. তারপর West Bengal Land-Revenue and Cess (Apportionment) Act, 1963. কিন্তু বাংলায় ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত গ্রামবাংলার জমিদার ও জোতদারদের (ভূমিস্বত্ব কাগজে কলমে না থাকলেও) প্রভাব সেভাবে কমেনি। কারণ আইন যেমন ছিল, তেমনি আইনের ফাঁকও বর্তমান ছিল। জোতদাররা সেই আইনের ফাঁক দিয়েই বারবার গলে যেতেন। এর ফলেই হয়তো কৃষকদের দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিত ক্ষোভ নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই বিষয়ে শরদিন্দু সান্যাল সম্পাদিত 'ধনধান্যে' (প্রথম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯, নিউ দিল্লী-১) পত্রিকায় হরেকৃষ্ণ কোঙার, ডি.বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী সেন, এস.কে.দে, এম.এল. দাণ্ডওয়ালা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দক্ষিণা চক্কোত্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন গ্রামের মধ্যে ভোটকেন্দ্রিক সাংবিধানিক রাজনীতির স্বল্প পরিচয় লাভ করি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মত না হলেও এখানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে ব্যাবসাভিত্তিক অর্থনীতির কিংবা জমিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে নগদ পুঁজিনির্ভর অর্থনীতির প্রচ্ছন্ন পরোক্ষ একটা লড়াই যেন অনুভব করি। এখানে অনাথবন্ধু বসু জমিদার না হয়েও যেন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। তাই তার আপাতদৃষ্টিতে হেরে যাওয়া যেন অমোঘ নিয়তির মত অনিবার্য। সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের এই সনাতন ঐতিহ্যই যেন লেখক রক্ষা করেন প্রকৃতির বাণ, ধানের যম মাজরা পোকাকে পাঠিয়ে দিয়ে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে যেন বংশী কাপালি। যার জয় পুঁজিবাদী সময়ের গতিপ্রবাহে নিয়তির মত নিশ্চিত। আর সেই জয়কে ত্বরান্বিত করার জন্য ভাগ্যক্রমে বংশী কাপালি পায় তামাকের বস্তায় তামাকের পরিবর্তে বস্তাভর্তি টাকা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মত আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সেই চরিত্রের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সম্বোধনও যে ধীরে ধীরে পাল্টে যায়, তা

আমরা এখানেও দেখতে পাই, ''বছর দেড়েক আগেও স্টেশনবাজারে ছোকরার নাম ছিল— বংশী তেলেভাজা। তারপর কিছুদিন বাদে ওকে সবাই বলতে লাগল— হোলসেলার বংশী। এখন টোবাকো মারচেন্ট বি.সি.কাপালি। নামের মাঝে চন্দ্রটা যে এতকাল কি করে লুকিয়েছিল ! ঈশ্বরীতলায় যাত্রা, থিয়েটার, ফুটবল-সবকিছুতেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক এখন বি.সি.কাপালি।''[১৫] সবকিছু বিক্রি করে অনাথবন্ধু বসুর ঈশ্বরীতলা ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়ে ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় এবং বংশী কাপালির অনাথবন্ধুর সাধের বাড়িসহ সব সম্পত্তি কিনে দখল নেওয়ার মধ্যে যেন লেখক সময়ের বৃত্তটিকে সম্পন্ন করেন। পরিবর্তিত সময়-সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্যকে এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে। এক প্রকার প্রচ্ছন্ন দীর্ঘনিশ্বাস বরাদ্দ থাকত তারাশঙ্করের উপন্যাসে সময়ের কাছে হেরে যাওয়া প্রতিনিধিদের জন্য। এখানেও ঈশ্বরীতলার মানুষদের অনাথবন্ধু বসুর জন্য এক প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ দেখি। অনাথের সপরিবারে কলকাতায় চলে যাওয়াটা তাদের কাছে কিছুটা দুঃখের বিষয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় গিয়ে শ্যামল যে জমিটি কেনেন, তার আয়তন ছিল ৩১ কাঠা। অবশ্য তার মধ্যে পুকুর খনন করা হয়েছিল ১৬ কাঠা জমি নিয়ে। আর মূল বাড়িটি ৯ কাঠা জমিতে তৈরি করা হয়েছিল। এই বাড়ি তৈরি প্রসঙ্গে লেখক জানান, ''একবার একটা ইঁটখোলা করেছিলাম। লক্ষণ, পঞ্চানন হাজরা, শরৎ ইঁট কাটতে আসত শেষরাতে। লাথগঞ্জের ইঁট। ... তাই দিয়ে বাড়ি গেঁথে তুললাম। দেখলাম ইঁটখোলার কিছুই ফেলা যায় না। ঝামা ভেঙে খোয়া। ছাই হল গাঁথুনির মশলা। পৃথিবীর খানিকটা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীর গায়ে বাড়ি।''[১৬] তিনি শুধু বাড়িই তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি। খালের পাশ দিয়ে নিজের বাড়ি অব্দি ছিল একটি কাঁচা রাস্তা। নিজের তৈরি ইঁট দিয়ে সে রাস্তা পাকা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তার দু'ধারে বারুইপুর থেকে কিনে আনা গাছের চারা লাগিয়েছিলেন লেখক। এখনো সেই অঞ্চলে এই রাস্তা 'শ্যামল বাঙালের রাস্তা' নামে পরিচিত। এই রাস্তাই উঠে এসেছিল লেখকের 'গত জন্মের রাস্তা' ছোটগল্পে। চম্পাহাটির বাড়িতেই বাছুর সমেত হরিয়ানা গাই, হাঁস, মুরগি, ছাগলসহ শ্যামল বাঙালের চিড়িয়াখানা তৈরি হয়। তাঁর পোষা গরুকে আমরা আবার দেখতে পাই 'সরমা ও নীলকান্ত' উপন্যাসেও। গরু পুষতে গিয়ে লেখক নানা প্রকার গোবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেন। গ্রাম বাংলায় গরুর হাড়ের চিকিৎসকদের বলে 'হাড়ো খাঁ'। উপন্যাসে দেখি 'উমা'কে কৃত্রিম প্রজননের জন্য বিরজা ডাক্তার আমেরিকার ওহিও ষাঁড়ের বীর্য ব্যবহার করে। আসলে তৎকালীন সময়ে ভারত সরকার সুস্থ বাচ্চা, সুস্থ মা

পাবার জন্য এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে আইস বক্সে ওহিও ষাঁড়ের বীর্য আমদানি করত আমেরিকা থেকে। কৃত্রিম প্রজননের জন্য সেটা সরকার গ্রামে গ্রামে পাঠাত। এসব তথ্য গোবদ্যি সূত্রেই লাভ করেন লেখক। লেখক নির্মিত চিড়িয়াখানায় ছিল লেখকের প্রথম পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাঘা যে আরও অনেক রচনাতেই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। বাঘার হারিয়ে যাওয়া, ফিরে পাওয়া, ডাকাতদের দেওয়া বিষে মৃত্যু— সবই প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনেই উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে।

চম্পাহাটির এই বাড়িতে বসেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের খেজুরের রস দিয়ে তৈরি তাড়ির নেশার সূত্রপাত হয়। সঙ্গে চাট হিসাবে থাকত হাতে গরম চিতি কাঁকড়া ভাজা। জমির নেশা শ্যামলকে টেনে এনেছিল চম্পাহাটিতে— কিন্তু এরপরেই তাড়ির নেশার সঙ্গে সঙ্গে জমি সংক্রান্ত আর একটি বড় নেশা পেয়ে বসে তাকে, ''জমির সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন্ অতীত থেকে নাড়ির যোগ— সবই আমাকে ভাবাতে লাগল।''[১৭] কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ফসল বিশেষত ধান চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। আমন ও বোরো ধান ছাড়াও একপ্রকার হাইব্রিড ধানের চাষ চম্পাহাটিতে শুরু করেন লেখক। গ্রাম সাপেক্ষে একেবারে নতুন পদ্ধতিতে নিজের বাড়ির ছাদে সেলোফেন পেতে কাঠের গুড়ো ছড়িয়ে সফলভাবে তৈরি করেছিলেন ধানের বীজতলা। এজন্যই তাকে এই সময় দায়িত্ব দেওয়া হয় আনন্দবাজার পত্রিকার কৃষি বিষয়ক সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র 'ভূমিলক্ষ্মী' সম্পাদনার, যেখানে তিনি 'বলরাম' ছদ্মনাম দিয়ে লেখালেখি করতেন । আরও বেশি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্যামলকে পাঠানো হয় সবুজ বিপ্লবের অন্যতম পীঠস্থান পাঞ্জাবে যেখানে তিনি কৃষি-শিক্ষা বিষয়ক পঞ্চাশ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় রয়েছে ঘুটিয়ারি শরিফের মাজার। প্রতি বছর এই মাজারকে কেন্দ্র করে (বর্তমানে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত) মেলা বসে। এই মেলা বসার দিনই ১৯৭২ খ্রি: শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সপরিবারে চম্পাইহাটি ত্যাগ করেন। চম্পাহাটি ত্যাগ করার পরেও শ্যামল গঙ্গোপায়ের কৃষিকাজ নিয়ে আগ্রহ একটুও কমেনি। তাই আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যেই বিদেশের চাষবাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যায় ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় ও জাপানে। এই আগ্রহের সূত্রেই সখ্য হয়েছিল বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরিচয় হয় বোড়ালের উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যিনি পরবর্তীকালে 'ভগবান বুনো

রায়ের বংশধর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেন। কলকাতাতেও ধান চাষ করার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। কারণ সুযোগ পেয়েছিলেন বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতীর আত্মীয় শীতল চৌধুরীর বেহালার বাগানবাড়িতে চাষ করার। প্রায় আঠারো বিঘা জমিতে পুনরায় ধান চাষ শুরু করেন লেখক, যদিও এখানে চম্পাহাটির মত সফল হতে পারেননি। অন্যদিকে চম্পাহাটির ভাগচাষীরা যাতে অনাহারে না থাকে তার জন্য চম্পাহাটির গ্রামের বাড়ি বন্ধক রেখে ভাগচাষীদের দিয়েই ধানচাষ করাতেন শ্যামল। এই ধান বিক্রির টাকা থেকেই বারুইপুরের ব্যাঙ্কের লোন শোধ করতেন লেখক।

চম্পাহাটিতে থাকাকালীন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ঘড়িচাঁদ, শরৎ, বেচো, ঘটি, কালো, খগেন, বজরা, হৃদয়, পঞ্চানন হাজরা, মদন, ভগীরথ, গণেশ, লক্ষ্মণ, ভদ্রেশ্বর, নাদু, পালান, সন্তোষ প্রমুখের সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। এরা সেই সময়কার সমাজের সবচেয়ে হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত নিরক্ষর মানুষ ছিল। এদের মধ্যে কেউ ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর কেউ বা আবার চোর, ডাকাত, জেল খাটা আসামী। এদেরকে সমাজের সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে অনাযাসে গণ্য করা যেতে পারে। গায়ে জামা পরা এদের কাছে বিলাসিতা। লেখকের কাছে এইসব মানুষেরা জীবনচর্যায় অন্যতম সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। শহুরে মানসিকতা ও অভিজাত শ্রেণির মানসিকতার ছাঁচ থেকে অনায়াসেই লেখক নিজেকে আলাদা করতে পেরেছিল। তাই চিতি কাঁকড়া ভাজার সঙ্গে তাড়ি খেতে, ওলের ডালনা খেতে কিংবা ক্ল্যারিওনেটের পাশে বসে একসঙ্গে যাত্রা দেখতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কখনও অস্বস্তি হয়নি। এদের কাছে শ্যামল ছিলেন 'দা-ঠাকুর'। এদের সঙ্গে মেশার জন্য নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করতে হয়। আর তা করতে গিয়েই লেখককে খুন করতে হয় কংক্রিটের জঙ্গলে বসবাসকারী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে কিছু গেঁথে যাওয়া ধ্যান-ধারণাকে। শুধু মেলামেশিই নয়, ঐ অঞ্চলের বিভিন্নরকম উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। ভারত সরকার ১৯৯৫ সালে প্রথম বিদ্যালয়ে মিড্-ডে মিল প্রকল্পটি শুরু করে। 'জাতীয় পুষ্টি সহায়তা' প্রকল্পের অন্তর্গত এই প্রকল্পটি শুরু হয়। কিন্তু শিক্ষানীতি যৌথ (কেন্দ্র ও রাজ্য) সহমতের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর হবার সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রান্না করা খাবার দেবার পরিবর্তে চাল, গম, ছাতু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিতড়ণ করত। তবে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রান্না করা খাবার দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে মিড-ডে মিলের প্রচলন দেখি— এই ধরনের ব্যাবস্থা অনেক আগেই লেখক প্রবর্তন করেছিলেন চম্পাহাটির

স্কুলে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্তিত মিড-ডে মিলে থাকত বুলগারের খিচুড়ি, গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুট। এই বুলগারের খিচুড়ি আসত আমেরিকার একটি সংস্থা থেকে। সর্বহারা চাষীদের সাহায্য করা, সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, তাদের সঙ্গে দিনযাপন— এভাবেই গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে গ্রামের কিছু মাতব্বর, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে লেখক চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় তাকে হয়রানির চেষ্টা করা হয়, যদিও সফল হতে পারে না। 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট দক্ষিণা চক্কোত্তির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ডাকাতদের উৎপাতও বেড়ে যায় চম্পাহাটির বাড়িতে। এছাড়াও মেয়েদের ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা, তাদের সুরক্ষা ও পড়াশোনা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে লেখক চম্পাহাটি ত্যাগ করেন। তবে নিয়ে যান নিজের ঘাম দিয়ে অর্জিত এক বিপুল অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বাস্তব চরিত্র লেখকের বিভিন্ন লেখায় ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। 'কুবেরের বিষয় আশয়' ছাড়া বাকি তিনটি গ্রাম-মফস্বল কেন্দ্রিক উপন্যাসই (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, স্বর্গের আগের স্টেশন, চন্দনেশ্বর জংশন) চম্পাহাটি ত্যাগ করে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বসে লেখা।

তবে উপরিউক্ত চারটি উপন্যাসের মধ্যে 'স্বর্গের আগের স্টেশন' ও 'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাস দুটিতেই আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটি অঞ্চলের তৎকালীন সময়ের গ্রাম জীবনের সাধারণ ছবি, গ্রামীণ সমাজ, সেই সমাজের রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও গ্রামীণ মানুষের বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত ছবি পাই। কারণ স্পটলাইটের আলো কুবের বা অনাথবন্ধুর মত চরিত্র অপেক্ষা খগেন, বজরা, হৃদয় নস্কর প্রমুখ চরিত্রের ওপর বেশি করে পড়েছে। তাদের মত চরিত্রই এই দু'টি উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তৎকালীন সময়, সমাজ, ঐতিহ্য এই দুটি উপন্যাসের নিরিখে সূত্রাকারে নীচে উল্লেখিত হলো। যথা—

ক. সাধারণত এই অঞ্চলের জমি একফসলি। আর সেই ফসল হলো ধান। সেচ ব্যবস্থার সেরকম সুযোগ না থাকায় বর্ষাকালই একমাত্র ভরসা। অকর্ষিত জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যা এই অঞ্চলে 'বাদা' নামে পরিচিত।

খ. সমুদ্র সংলগ্ন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাটি। ফলে রোদের প্রভাবে জমিতে নোনা ফুটে ওঠে। তখন বাড়ির নারী, পুরুষ, সন্তানসহ সকল মিলে জমিতে বসে পড়ে। আর নোনা ফোটা মাটি

ভাঙা কলাই থালায় কাচিয়ে-কাচিয়ে তোলে। সেই মাটি গরম জলে ফুটিয়ে লবণ বের করা এই অঞ্চলের একটি পদ্ধতি লবণ আবার কেউ বাজার থেকে কিনতে পারে, এই অঞ্চলের গরীব মানুষের কাছে তা কল্পনাতীত বিষয়।

গ. বাজারে নুন বিক্রির টাকা থেকেই গরীব মানুষেরা দৈনন্দিন আহার্যের কিছুটা ক্রয় করতে পারে। গরীবের ঘরে আহার্য হিসাবে জনপ্রিয় গমের আটার পরিবর্তে ভুট্টার আটা। শাকের মধ্যে শুষনি বা মেথি শাকের ডগা।

ঘ. শুধুমাত্র কৃষিকাজকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলে সারাবছরের জীবিকা নির্বাহ কঠিন বলে কিছু দুঃসাহসী মানুষের রাতের জীবিকা হয়ে ওঠে ডাকাতি। ফলে ডাকাতের উৎপাত এই অঞ্চলে সরল জীবনচর্যায় মাঝে মাঝেই উত্তেজনা নিয়ে আসে । ডাকাতের ভয়ে কতিপয় সম্পন্ন ঘরের কর্তারা রাতে কুপি জ্বালিয়ে কেউ বন্দুক নিয়ে বা না নিয়ে রাত জাগে। লেখকের গ্রাম কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে তাই ডাকাতের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখতে পাই। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় তার ‘আমার শ্যামল’ গ্রন্থে চম্পাহাটি ত্যাগ করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে ‘ডাকাতের উৎপাত’ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। যদিও শ্যামলের চম্পাহাটিতে মেলামেশির তালিকায় ডাকাত-চোর ইত্যাদি পেশাধারী মানুষও ছিল।

ঙ. এই অঞ্চলে ডাকাতি করবার পূর্বে পাহারাদার কুকুরকে বাজররণ (ফনিমনসা বা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ) গাছের আঠা খাওয়ানো হয়। ফলে কুকুর বোবা হয়ে যায়। পেটের নাড়িভুঁড়ি পচে গিয়ে ধীরে ধীরে কুকুর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। এই অঞ্চলের লোকেরা বলে, কুকুরের ‘মুখন্ডী’ হয়েছে। লেখকের পোষা কুকুর বাঘাকেও ‘মুখন্ডী’ করে মেরে ফেলে ডাকাতদের কেউ। সেই ডাকাত হয়তো দিনের বেলায় চাষী হিসাবে লেখকের সঙ্গে বসেই তাড়ি খেতে খেতে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয় লেখকের সঙ্গে।

চ. যে কোনও গ্রামের মতো এই অঞ্চলের গ্রামগুলোতেও কতিপয় সম্পন্ন ঘরের অন্যতম ব্যবসা ছিল ‘বন্ধকি’ কারবার। ‘বন্ধকি’ জিনিস হিসাবে বগিথালা, রূপোর বিছে, পেতলের গাড়ু ইত্যাদি থাকত। এমনকি থাকত আবাদী জমি, বাস্তু ভিটা। ‘ঈশ্বরীতলার রূপোকথা’ উপন্যাসে ওষ্ঠ জানায়, তেষট্টি টাকার জন্য তাদের বাস্তু সাত বছর বাঁধা ছিল। সুদ না পেলে মহাজন এসে খাতকের বাড়ি থেকে গাই গরু ছিনিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, গাই গরু টেনে নিয়েও মহাজনের যদি মন না ভরে কিংবা খাতকের বাড়িতে গাই গরু না থাকলে, খাতকের স্ত্রীকে (পোয়াতি হলেও), কন্যাকে

মহাজনের বাড়িতে পেটেভাতে বেগার পরিশ্রম করার জন্য যেতে হয়। মহাজনের বাড়িতে প্রধান কাজ হলো ধান সেদ্ধ করা ও তা শুকিয়ে ভাঙনের জন্য প্রস্তু করা। গর্ভবতী মহিলারা নিজেদের শরীরে পুষ্টির অভাব মেটানোর জন্য মহাজনের বাড়ির গরুর বরাদ্দ ফ্যান চুরি করে খায়।

ছ. এই অঞ্চলের তৎকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন, ''এখানে হাসপাতালের নাম কলেজ। হাতুড়ে ডাক্তারের নাম বদ্যি। দুর্গাপুজোর নাম বড় পুজো। গোহালে খয়াটে গাই। এঁড়ে বেশি। বাড়ির বউরা আর গাই সমানে পোয়াতি হয়। লোক বাড়ছে। গরু-বাছুর বাড়ছে। মাঠে ঘাস কম। গাদ সমেত তেলো তাড়ি খেয়ে তিরিশ বছরের জোয়ানের চেহেরা পাকিয়ে যাচ্ছে। লিভার জখম। কাজ নেই। জমি নেই। উৎসব বলতে পঞ্চাননতলায় বোশেখ মাস জুড়ে হরিনাম।'' [স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ১১]

জ. হাঘরে হাভাতে মানুষজন মাঠে মাঠে ইঁদুরের গর্তে ইঁদুরের মজুত করা ধান সংগ্রহ করে পেটের ভাত জোগার করে। 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসে খগেনের বড় ছেলে হাজরা এই ধরনের কাজে দক্ষ। নোনা মাটির দরুণ মিষ্টি জলের টিউবওয়েলের চাহিদা এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের রয়েছে। বাদা ও উষ্ণ অঞ্চল জন্যে সাপের দেখা পাওয়া এখানে স্বাভাবিক ঘটনা। তবে বিষধর সাপকেও এই অঞ্চলের মানুষ ঘটায় না। বাস্তু সাপ থাকা এখানে মঙ্গলজনক ব্যাপার। সাপেদের মধ্যে হাসাকেউটে, কালাচ, শামুকভাঙানি, খড়িচোঁচ, চন্দ্রবোড়া, গেঁড়িভাঙা, মেছো কেউটে ইত্যাদি এই অঞ্চলে দেখা যায়।

ঝ. দুর্গাপুজো ছাড়াও পৌষমাসে বাস্তুপুজো, নালপুজো, ভাদ্র সংক্রান্তির পরের দিন রান্নাপুজো ইত্যাদি এসব অঞ্চলে পালিত হয়।

''নানান সময়কে জুড়ে আস্ত একটি যুগ করে দেয় যে ফেবিকল, তাই-ই বন্ধুত্ব। নতুন নতুন তিরিশ পেরিয়ে তাই একদিন কলকাতায় অ্যানউন্স করি—আয় মেশামেশি করি। ঘন ভালোবাসাবাসি করি। আমিই লাভ লাভ অ্যান্ড লাভ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। খুব কনডেন্সড বন্ধুত্বর জন্যে অনেকদিন আগে সবাইকে ডেকেছিলাম— আয় আমার কাছে দুশো টাকা আছে, আমার সঙ্গে মিশবি?''[১৮] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে এই কথা বলেছেন। 'বন্ধুত্ব' শ্যামলের আমৃত্যু সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া একটি বিষয়। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। কারণ এই সময়েই একঝাঁক তরুণের হাত ধরে সাহিত্যের জগতে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সন্দীপন

চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, উৎপল বসু, বিমল রায়চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও আরও নবীন অনুজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব ছিল। আর এই বন্ধুত্বেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো আড্ডা। তবে এই আড্ডা বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আড্ডা শ্যামলের তেমন পছন্দ ছিল না। দু'একজনের সঙ্গে নিবিড় হয়ে থাকতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করত।"[১৯] লেকখের কাছে পান করাটা (নেশা জাতীয় দ্রব্য) ছিল নিবিড়ভাবে মেলামেশার একটা অছিলা মাত্র। আসলে লেখকমন সর্বদা বন্ধুত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত। এই বন্ধুত্ব পাবার জন্যেই মেশামেশি। তার থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হত— তাই উঠে আসত লেখকের রচনায়। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতা হল, বন্ধুত্বের কোনও শ্রেণি বিভাগ লেখকের অভিধানে ছিল না। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য এসে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে তৈরি হয় দূরত্ব। ধীরে ধীরে নিজস্ব বৃত্ত-পরিধি নির্মিত হয়। গূঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়। বিবাহ, সন্তান মানুষের জীবনে অন্যতম মনোযোগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। লেখক নিজেই বলেছেন, ''এই ব্যাপারটা বলছি এই কারণে যে লেখার শুরু হয় যন্ত্রণা, আবেগ থেকে। তা থেকে বাড়ি-ঘরদোর হয়ে গেলে— লেখাটা প্রফেশন হয়ে গেলে তার ভেতর দক্ষতা যেমন আসে তেমনি হারাবার জিনিসও অনেক ঘটে। যার প্রথম বলি— বন্ধু। কারণ লেখককে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বন্ধু আর লেখাকে মিলিয়ে মিশিয়েই তো আমরা হয়ে উঠেছিলাম। তার ভেতর বন্ধু হয়ে গেল ব্যস্ত। কেজো। দরকারের কড়ি যোগাড়ে সে জড়িয়ে গেল। পড়ে থাকল লেখা।"[২০] এর ফলেই হয়তো শ্যামলের মনে গেঁথে গিয়েছিল বন্ধুত্ব হারানো যন্ত্রণা। আগের সেই বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরে পাবার একটা তাড়না সুপ্তভাবে আমৃত্যু লেখক অনুভব করে গেছেন। কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে আজীবন ধরে তিনি খুঁজে গেছেন নিজের আত্মার আত্মীয়। কুবের, অনাথ যেমন শ্যামলের একটি সত্তার বহিঃপ্রকাশ তেমনি 'নির্বান্ধব' উপন্যাসের নিবারণ পাকড়াশি লেখকের 'বন্ধুত্ব' সত্তার 'অল্টার ইগো'। এই নিবারণের মাধ্যমে লেখক 'বলি দেওয়া' বন্ধুত্বের হারানো সময়কে তুলে ধরেছেন। নির্বান্ধব থাকার যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন। অন্বেষণ, আবিষ্কার তুলে ধরেছেন। লেখকের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নিবারণ পাকড়াশির বক্তব্য তুলে ধরে আমাদের মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করব—

ক. ''জানো রেবা, আমি 'ভালোবাসা প্রাইভেট লিমিটেড' নাম দিয়ে একটা কোম্পানি খুলব। সবাই সেখানে নানারকম ভালোবাসার শেয়ার কিনতে পারে। বাৎসল্য, পরকীয়া, নেহাৎ বন্ধুত্ব, অষ্টপ্রহর মেশামিশি— সবকিছুর শেয়ার থাকবে। ভালোবাসা ছাড়া ওয়ার্ল্ডে সত্যি আর কিছু নেই।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ১৫]

খ. ''কারও সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক্ হয় না। সাইড টক্ হয় না। আমার কাছে আমার নিজের বা পরের কোনও গোপন কথা লুকানো নেই। আমি কোনওদিন দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার চান্স পাইনি। কেউ আমাকে কানে কানে কোনওদিন কিছু বলেনি। সো কল্ড্ বন্ধুদের কোডে কথা বলে হাসাহাসি করতে দেখে আমি আন্দাজে তাদের সঙ্গে গোবোধের হাসি হেসেছি শুধু।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ২১]

বন্ধুত্ব ছাড়াও যে সময় উপন্যাসে উঠে এসেছে, তা হলো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের একেবারে প্রথম পর্ব। যে সময় তিনি বেলুড়ের 'গ্রেট ন্যাশনাল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল' কোম্পানিতে কাজ করতেন। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের বুকে ইস্পাত তৈরির কোম্পানির অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই ফুটে উঠেছে। এই ধরনের কোম্পানিতে কর্মচারী ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

ক. ''চিত্তরঞ্জনে তখনও ইনজিন তৈরি শুরু হয়নি। ভিলাই, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর নেহরুর স্বপ্নের আঁতুড়ে। এখনকার বোকারো তখন ফাঁকা মাঠে চুয়াল্লিশখানা গ্রাম। ইস্পাতের বাজারে টাটা, বার্ণপুর একচ্ছত্র।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ২৯]

খ. ''বাজারে লোহার দর নেই। তখন কোথায় ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যে, সরকার কেনাকাটা শুরু করবে। বাড়িঘর তৈরির ফাইভ-এইট রড, রেন ওয়াটার পাইপ আর কড়াই তৈরি হচ্ছে গুচ্ছের। কিন্তু বড় বড় ঢালাই কে করাবে? জগন্নাথদাস-বদ্রীদাস ওপেন হার্থ ফারনেস বসিয়েছে ঠিকই। কিন্তু অতবড় রাক্ষসের আহার যুগিয়ে থই পাচ্ছে না বাজারে। তাই ফারনেসের নামে কেনা স্ক্র্যাফ আয়রণ বাঁ হাত দিয়ে জাপানকে ঝেড়ে দিয়ে দুপয়সা করছে।'' [নির্বান্ধব, পৃ. ৩০]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫২-এর শেষের দিকে বেলুড়ের ইস্পাত কারখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার হিসাবে। স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুর দিকে কলকাতার ইস্পাত কারখানার ছবি এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় লেখক এখানে কাজ করেছিলেন। ফলে একটা বিশ্বাসযোগ্য তৎকালীন সময়ের ছবি আমরা 'নির্বান্ধব'

উপন্যাসে পাই।

চম্পাহাটি ত্যাগ করার পর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলকাতায় নতুন ঠিকানা হয় প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাড়ি। প্রথম তিন মাস কল্যাণ মুখার্জির বাড়িতে ভাড়া থাকার পর উঠে আসে ৫০/১ প্রতাপাদিত্য রোডের নতুন ভাড়া বাড়িতে। এই সময়েই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলার থিয়েটার জগতের কিছু বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে। যেমন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই তৎকালীন সময়ে কলকাতার 'নান্দীকার' গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনোজ মিত্রের সঙ্গেও লেখকের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। লেখক বলেছেন, ''গান শুনি প্রভার মেয়ের কেতকী— ছোড়দির। কলকাতার স্টেজের ধুলো তখন নাকে যেত। রিহার্সাল দেখতাম। বেপরোয়া অসীম, সাহসী কেয়া, অকুতোভয় অজিতেশ, রসিক মনোজ— এরা সবাই এক একজন দিকপাল লোক। নাটক লেখা, মহলা, হল আর টাকা যোগাড়, দর্শক ভোলানো— সব ব্যাপারেই এরা যেন বালজাকের হিউম্যান কমেডির এক একটি অংশ। এদের দেখেই আমার মনে অদ্য শেষ রজনী এসেছিল।''[২১] কলকাতা শহর রঙ্গমঞ্চের শহর, গ্রুপ থিয়েটারের শহর। 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে মধ্য সত্তরের দশকে কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারের অবস্থা, থিয়েটার সংশ্লিষ্ট কুশীলব-সমাজ এবং গ্রুপ থিয়েটারের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, গ্রুপ থিয়েটারের জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্য হিসাবে রয়েছে বাণিজ্যিক থিয়েটারের বিরোধিতা। থিম, বিষয়বস্তু, অভিনয় কৌশল, উপস্থাপনা ভঙ্গি নিয়ে সর্বদা পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাব—এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বার্তা, লেখক-দর্শন দর্শকের সামনে তুলে ধরাই গ্রুপ থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, গ্রুপ থিয়েটার যখন সফলতার শীর্ষে পৌঁছায় তখন প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি গ্রুপ থিয়েটারের শরীরে আঠার মত লেগে যায়। আর্থিক সচ্ছলতা গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিটি সদস্য অনুভব করতে থাকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা থিয়েটার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মনে ভীতির সঞ্চার করে— তখনই গ্রুপ থিয়েটারের মৃত্যু সুনিশ্চিত হয়ে যায়। গ্রুপ থিয়েটারের এই ঐতিহ্যকেই লেখক তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আমরা উপন্যাসের কাহিনিতেও দেখতে পাই 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটার যখন সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছে— সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পতনের অভিমুখে যাত্রা করেছে। যে পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাবের জন্য গ্রুপ থিয়েটার বিখ্যাত, তা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যদিও কতিপয় মানুষ তারপরেও পরীক্ষাপ্রবণ মনোভাব নিয়ে লড়ে যায় (উপন্যাসে যেমন অমিয়

বন্দ্যোপাধ্যায়)। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্বেই রয়েছে গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক, নৈষ্ঠিক সহযোগ। উপন্যাসে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারে মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ যেভাবে শোনা গিয়েছে—

ক. ''অমিয় পরিষ্কার জানে— সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া রেশন হাউসফুল একস্ট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিনয়ের একঘেয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।'' [অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ২৯০]

খ. ''মহলার পর গাড়ি গিয়ে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এখন। খিদে পেলে খাবার আছে। চান করার বাথরুম। শোবার ঘর— সবই আছে। নেই সেই আগেকার দল বেঁধে কিছু করার উৎসাহ। সবাই কেমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছে। কারও পার্ট এখনো মুখস্থ হয়নি। সবাই জানে— মহলার পর নাটক স্টেজ হোক চাই না হোক— মাস গেলে মাইনেটা তো পাব।'' [অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ৩২৬]

এভাবেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে পতনের বীজ অঙ্কুরিত হবার সনাতন ঐতিহ্যের কথা শোনায়।

এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন সময়ে কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটারের সমাজকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের ভেতরকার লড়াই, আর্থিক অভাবকে সঙ্গী করেই একটি গ্রুপ থিয়েটারের পথ চলা, অভাবের দিনে গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের জোট বেঁধে থাকা, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও সৎ চেষ্টা ও আশাকে সঙ্গী করে স্টেজে নাটক নামানো ও অভিনয়, উপস্থাপনা কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করা, নাটকের রিহার্সাল, মঞ্চ তৈরি করা, ভবন থিয়েটার উপযোগী করে তৈরি করা, পোষাক-সেট ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা এই উপন্যাসে পাই 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে। আবার মঞ্চের জীবনের থেকেও মঞ্চের পর্দার আড়ালে যে জীবনধর্মী নাটক চলতে থাকে— সেই জীবনে যে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-সাধ-সাফল্য-ব্যর্থতা প্রতিফিলিত হয় থিয়েটার সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে— তারও একটি বিশ্বাযোগ্য ছবি এঁকেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। লেখক মধ্য-সত্তরের দশকে বিভিন্ন দিক্‌পাল নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে শুধু আড্ডা মারার জন্য মেশেননি— আরও বড় উদ্দেশ্য ছিল তাদের সমাজ-জীবনে প্রবেশ করা— আর তাতে তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কারণ উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র অমিয়-রজনীর মধ্যে স্পষ্ট ছাপ ছিল তৎকালীন কলকাতার

গ্রুপ থিয়েটারের দিকপাল দুই চরিত্র যথাক্রমে অসীম চক্রবর্তী ও কেতকী দত্তের। এজন্যই হয়তো ১৯৭৫খ্রি. 'বেতার জগৎ' পত্রিকা লেখকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েও উপন্যাসটি ছাপতে আগ্রহ দেখায়নি। এই সব বিষয় ছাড়াও তৎকালীন সময়ে গ্রুপ থিয়েটারকে লড়তে হয়েছে পাবলিসিটি-মার্কেটিং ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হওয়া যাত্রাপালার সঙ্গে। ষাটের দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে যাত্রায় আধুনিকতার হাওয়া লাগে। ফলে যাত্রায় যেমন তৎকালীন অনেক থিয়েটার অভিনেতা অভিনয় করতে শুরু করে তেমন দর্শক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ 'যাত্রা শিল্পের ইতিহাস' (১৯৯৬) গ্রন্থে। ওঁনার মতে, যাত্রার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পেছনে যে দুটি প্রতিষ্ঠানের বড় ভূমিকা ছিল সেই দুটি প্রতিষ্ঠান হলো— এক. 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠী এবং দুই. কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র 'বিবিধ ভারতী'। শংকরের বক্তব্যে সেটাই উঠে এসেছে, ''থিয়েটারের এখন আর কিছু নেই দাদা। সবটাই দর্শক। সবটাই যাত্রা। পাবলিসিটি বিল্ড-আপ। এই গ্রেটেস্ট মাস মিডিয়া শীগগিরি থিয়েটার-সিনেমাকে গিলে খাবে।"[২২] যাইহোক, গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট নিয়ে বাংলা সাহিত্যে 'অদ্য শেষ রজনী' পথিকৃৎ।

জমির নেশা, ফসলের নেশার সঙ্গে আরও একটি নেশা প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় লেখকের হয়েছিল সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে। লেখকের স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''তবে, তখন আর ধান চাষ নয়, পেয়ে বসল গাড়ির নেশা। সে এক মারাত্মক ব্যাপার বটে। একটা করে সেকেন্ড হ্যাণ্ড চার চাকার গাড়ি কিনছে, আর দুদিন বাদেই সেই গাড়িগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে, চালিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। আবার আর একটা নতুন সেকন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনছে। আর কেনা মানে কী? আবার তা বিক্রি।"[২৩] ফলে উপন্যাসে এই নেশার মাধ্যমেই উঠে এসেছে তৎকালীন সময়ে কলকাতার বুকে পুরানো গাড়ির ব্যবসা, বিভিন্ন রকমের ভিনটেজ্ গাড়ির পরিচয়, চাহিদা, মল্লিক বাজারের ছবি ইত্যাদি। দেশি, বিদেশী পুরানো গাড়ির এমন সম্যক পরিচয় হয়তো ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। শ্যামলের সব নেশার মধ্যেই কিছু তৈরি করার আনন্দ সর্বদা কাজ করে— আর যখন যা নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, সেটার মধ্যে গভীর সমুদ্রের ডুবুরির মত চলে নিরন্তর অবগাহন। শ্যামলের এই গাড়ির নেশার পরিচয় আমরা পাই 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দিলীপ বসুর মাধ্যমে। লেখকের মত দিলীপ বসুও বানাবার জিনিস, বাড়াবার জিনিস পাবার জন্য জীবনের যাত্রাপথে যেন ওৎ পেতে বসে থাকে। একবার পেলে সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় সেই জিনিসটি। আবার এই দিলীপ বসু তো কুবের,

অনাথের নাগরিক সংস্করণ। তাই একে আমরা লেখকের 'অল্টার ইগো' বলতেই পারি। উপন্যাসে দিলীপ কাজ করে কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে। ফলে কোল ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোটামুটি একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি এখানে পাই। সরকারি অফিসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন দিলীপ বসু। পেশাগত দক্ষতা অপেক্ষা মোসাহেবি প্রবণতা, গোষ্ঠীগত স্বার্থ, ইউনিয়নের হম্বি-তম্বি, কর্মদিবসের অপচয়, যোগ্য-দক্ষ কর্মচারীকে দিনের পর দিন বসিয়ে রেখে, কাজ করতে না দিয়ে নিজেদের দল (দক্ষতায় মরচে পড়া মানুষদের দল) ভারী করা, কর্মসংস্কৃতির গড়িয়ে গড়িয়ে চলা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির ঘুণ ধরা ইত্যাদি বিষয় এখানে উঠে এসেছে। আসলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন বেসরকারি কয়লা খননকারি কোম্পানিগুলোর ন্যাশনালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী তাদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ একটি কোম্পানি। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হবার ফলে চাকরি সম্পর্কিত নিশ্চয়তা অনেক বেড়ে যায় এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ধীরে ধীরে গভীর অসুখের উপসর্গের মত দেখা দিতে থাকে। দিলীপ বসু সেই ঐতিহাসিক ট্রানজাকশন পিরিয়ডের অন্যতম সাক্ষী। দেড় দশকের ওপর কোল ইণ্ডিয়াতে চাকরি করে দিলীপের উপলব্ধি, ''এক এক সময় এদের অদ্ভুত লাগে দিলীপের। উঠতেও দেবে না তাকে। বাড়তেও দেবে না। প্রিয় দিলীপ— তোমাকে আমরা যে চেয়ারটি, যে টেলিফোনটি দিয়েছি— সেটি নিয়ে আমাদের পছন্দমত থাকো! ফাঁকি দাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়তে চেয়ো না। তোমায় যেমন রাখতে চাই তেমন থাকো দিলীপ। এক একদিন ভালো গাঁইতি দিয়ে এই ফ্লোরটা আগাগোড়া তার উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।''[২৪]

ঠিক এই সময় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘাড়ে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন জোগাড়ের দায়িত্ব এসে পরে। প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে লেখক এই দায়িত্ব সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে নেমে পরে। এই উদ্দীপনাই আমরা লক্ষ্য করতে পারি যখন দিলীপ বসু ভৌমিক ট্রাস্ট পরিচালিত খাদানের জন্যে ক্যাপিটাল সংগ্রহের কাজে নামে। কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনের জন্য লেখক যেমন বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ লোকের সঙ্গে মেশার জন্য ছুটতে হয়েছিল— তারই হুবহু প্রতিফলন দেখতে পাই খাদানের জন্য ক্যাপিটাল সংগ্রহের কাজে। এই কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ করে লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় একদা বাল্যসখীর। বাল্যসখীর নাম রাণু। যে সময় লেখকের সঙ্গে দেখা হয়, সেই সময় রাণু একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে কাজ করত। এর আগে বিবাহবিচ্ছিন্না রাণু বিদেশে গিয়ে ভুল ইংরেজীর সঙ্গে বিউটিশিয়ানের কোর্স করে এসেছিল। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে রাণুর কর্মতৎপরতা

ভালো লাগে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের। মানুষকে আকর্ষণ করার একটা সহজাত দক্ষতা রাণুর মধ্যে দেখতে পায় লেখক। তাই রাণুকে কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতে বলেন শ্যামল। রাণুকে নিয়ে লেখক যান হেওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। হেওয়ার্ড তাদেরকে নেমতন্ন করে তার ভিলায় আসার জন্য। সেখানে রাণুকে দেখে শ্যামলের উপলব্ধি, ''রাণু খানিক বাদে সুইমিং কস্টিউম পরে এসে জলে ঝাঁপ দিল। সেই প্রথম আমি রাণুর ফিগার দেখলাম। দারুণ। ছোটবেলায় ভালবেসে কী বোকার মত মিনমিন করতাম। আসলে আমার মত লোককেই বোধহয় মেনিমুখো বলা হয়।

আমরা ছ'মাসের বিজ্ঞাপন পেলাম।''[২৫] শ্যামলের একদা এই বাল্যসখী রাণু এই উপন্যাসে রূপ পেয়েছে দিলীপের বাল্যসখী স্বাতী হিসাবে। হেওয়ার্ড সাহেব উপন্যাসে হয়েছেন স্যার লেজলি উড। উপরে উল্লিখিত ঘটনার প্রায় হুবহ প্রতিরূপ দেখতে পাই স্যার লেজলি উডের ফ্যামিলি ভিলায়। উপন্যাসেও স্বাতী দিলীপ বসুকে সাহায্য করেছে ভৌমিক খাদানের জন্য ক্যাপিটাল সংগ্রহে। কিছু কিছু ঘটনা মানুষের স্মৃতিতে একটা গভীর দাগ কেটে রেখে যায়। লেখকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই সব ঘটনা অনেক উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন রূপে। এরকমই একটি ঘটনা ঘটে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় কর্মক্ষেত্রে। এই ঘটনার জন্য লেখক তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। সহজেই অনুমেয়, ঘটনাটি শ্যামলকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে। তবে যে ঘটনার কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেই ঘটনা পরবর্তী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর পদক্ষেপ লেখককে অনেক বেশি আহত করেছিল। এর ফলেই একটা বড় অভিমান লেখকের বুকে জন্ম নেয় পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতি। ১৯৭৬ খ্রি. আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে লেখকের যখন শেষবারের মত সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন শ্যামল 'চিফ সাব এডিটর' পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে লেখক ও সাংবাদিক সন্তোষ কুমার ঘোষকে মতান্তরের ফলে শ্যামলের 'সোয়াইন' বলাকে কেন্দ্র করে ঘটনা ঘটেছিল। যদিও দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে মতান্তরের জন্য উভয়ের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে মাসখানেক ধরে— তবে 'সোয়াইন', 'থাপ্পড়', 'হাত ভেঙে যাওয়া' ইত্যাদি সেই ক্ষোভ প্রবাহের চরম পরিণতি। এই অপ্রীতিকর চরম মুহূর্তের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর 'Domestic enquiry', 'Letter of regret,' সাসপেন্সন, প্রতিষ্ঠান শ্যামলকে 'ক্ষমা' করে কাজে যোগ দিতে বলা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। কিন্তু 'ক্ষমা' শব্দটি, সন্তোষকুমার ঘোষের

নিজের দুঃখ প্রকাশের চিঠি অফিসকে না দেওয়া কিংবা অফিসের চিঠিতে সেই চিঠির (সন্তোষকুমার ঘোষের চিঠি) উল্লেখ না থাকায় লেখকের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। ফলশ্রুতি ইস্তফা। যদিও পরবর্তীকালে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। উপরে উল্লিখিত ঘটনাটির সঙ্গে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই দিলীপ বসু ও তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনাথ চক্কোত্তির ঝামেলায়—

''কেন? কি বলতে হবে তোমাকে? অনাথবাবু! আপনি!!

ইউ সোয়াইন—

সোয়াইন মানে কি জানো তুমি? এখুনি উইথড্র করো। নয়তো ব্যথা পবে—

একশোবার বলবো। সোয়াইন। সোয়াইন। সোয়াইন।

দিলীপের ডান হাত একখানা ধারালো কুড়োল হয়ে অনাথের গালের দিকে ছুটে গেল।''[২৬]

তবে বাস্তব জীবনে সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন লেখক। তিনি স্বীকার করেছিলেন সন্তোষকুমারের কাছ থেকেই তিনি কাজ শিখেছিলেন। প্রচুর ভালোবাসা-প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। এজন্যই হয়তো যে উপন্যাসেই নায়কের অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোনও চরিত্র দেখানোর প্রয়োজন এসেছে, কিছু কল্পনার সংমিশ্রণে আমরা বারবার সন্তোষকুমার ঘোষকে ফিরে আসতে দেখি। উপরে বর্ণিত চরম মুহূর্তটিও নানান রূপে বিভিন্ন উপন্যাসে ফিরে এসেছে, অনেকটা সেজদার আত্মহত্যার ঘটনার মতো।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র দিলীপ বসুর একমাত্র ছেলে রবি। এই রবির মাধ্যমেই সত্তরের দশক যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের জন্য সমগ্র ভারতে চিহ্নিত হয়, সেই নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে নকশাল আন্দোলন বিষয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই এই বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার কোনও বক্তব্য আমরা পাই না। তবে রবির সঙ্গে মালবিকার, রবির সঙ্গে বিষ্ণুর এবং রবির সঙ্গে তার পিতা দিলীপ বসুর নকশাল আন্দোলন প্রসঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে নকশাল আন্দোলনের বিপরীত দিকেই শ্যামলের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে মানুষ খুন করা শ্যামলের মত দিলীপ বসুও কখনও মেনে নিতে পারেনি। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রসঙ্গে লেখক বলেন, ''আরও মুশকিলের কথা— আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি— অমুকে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ কবন্ধ

দানব। সেজন্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা।"[২৭] এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপুল বৈচিত্র্যময় রচনাসম্ভারে একটিও সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস নেই।

'অলীকবাবু' উপন্যাসে আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৈশোর থেকে যৌবনের মধ্যবর্তী অংশের সময়কে দেখতে পাই। সময়কাল বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক। এই দুই দশকের খুলনা, কলকাতা তথা দেশের তৎকালীন সমাজ, পরিস্থিতির আভাস এখানে পাই। এছাড়াও লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানান ঘটনা-প্রসঙ্গ, লেখক হয়ে ওঠার পর্বের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাই। লেখক বলেছেন, ''তখন যুদ্ধ চলে গেছে। পড়ে আছে ট্রেঞ্চ, ব্যাফেল ওয়াল, শহরের বাইরে মিলিটারির এয়ারস্ট্রিপ, কনডেন্সড মিল্ক, এ-আর-পি-র দমকল। কিছুকাল হল রেশন চালু হয়েছে। খবরের কাগজে পাশবিক অত্যাচারের খবর বেরোয়। পেনিসিলিন জিনিসটা ডাক্তাররা আলোচনা করেন। রমেনদের ছেলেবেলার শহরটা যুদ্ধ কাটিয়ে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে চাইছিল। সেই শান্ত নদী তীর। সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তা। উনিশশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সনের সামাজিক কাঠামো। কিন্তু তা তো হবার নয় আর! কন্ট্রাক্টর, পেনিসিলিন, দু'নম্বর খাতা, জালনোট এসে গেছে। এসে গেছে মানে-বইয়ের ডিউ পার্ট, রেশনের ডিউ স্লিপ।"[২৮] এটা সম্ভবত লেখক খুলনা শহরের কথা বলেছেন। কারণ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগে পর্যন্ত লেখকের জীবন কেটেছে খুলনা শহরে। আর খুলনা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন তৈরি করে এ.আর.পি. (Air Raid Precautions) সার্ভিস। ভারতবর্ষ যেহেতু তখনও ব্রিটিশদের অধীনে ছিল এবং ভারতীয় সেনারাও ব্রিটেনের পক্ষ নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এ.আর.পি-র দমকল পরিষেবা চালু হয়। খুলনা শহর সেই সব অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি ছিল। এই খুলনা শহরের বাইরে ভৈরব নদীর ওপর রুজভেল্ট জেটি তৈরি করা হয়েছিল। অধুনা বাংলাদেশের খুলনায় এখনও পূর্ব নামেই সেই জেটি রয়েছে। তৎকালীন সময়ে অনেক বেকার যুবকদের কাছে অর্থ রোজগারের একটি অন্যতম উপায় ছিল মিলিটারি ফিল্ড টেলিফোনের তার। তারের গায়ের রবার তুলে ভেতরের ধাতুটা বিক্রি করত কেজি দরে।

বর্তমান একুশ শতকের ভারতবর্ষে সরকারি চাকরি পাবার ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের গুরুত্ব আর ততটা নেই। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সরকারি চাকরি পাবার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল এটা। লেখক ব্যক্তিগত জীবনেও এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নানা চাকরির পরীক্ষায় বসেছিল। অবশ্য কোনও সরকারি চাকরিতে তিনি সেরকম সুবিধা

করতে পারেননি। উপন্যাসের কাহিনিতে রমেন ঘোষের বড়দা লেখকের বাস্তব জীবনের বড়দার অনুকরণে নির্মিত। বাস্তব জীবনের বড়দা সুখেন্দুবিকাশ যখন দেখেছে তার এক ভাই শ্যামলের কিছু হচ্ছে না, তখন সংসারে আরও কিছু টাকা আনার জন্য শ্যামলকে নিয়ে যায় রেসের ঘোড়াদের আস্তাবলে, ''ট্যাকসি গিয়ে থামল রেসের মাঠ ছাড়িয়ে গঙ্গার গায়ে এক বাগানে। তখনো হেস্টিংসে এত ঘরবাড়ি হয়নি। এত অফিস-কাছারি, নাবিক-গৃহ হয়নি। কয়েকটা পুরনো দিনের বাগানবাড়ি। নির্জন। গঙ্গার বাতাস উঠে সেসব গাছের মাথা দোলায় সারাদিন। তারই অবিরাম শব্দ।

বড়দা সেরকমই একটা বাগানবাড়িতে আমায় নিয়ে ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতে যাকে বলে সগর্বে— সেরকম মুখ করে বলল, এটা বর্ধমানের রাজার নিজের স্টেবল।

তখনো বুঝিনি। বড়দা আমায় নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল ফ্যামিলিতে যদি একজনও জকি থাকে তো মার দিয়া কেল্লা।''[২৯] এই ঘটনার অনুকরণ আমরা উপন্যাসে রমেন ঘোষের জকি হওয়ার চেষ্টা প্রসঙ্গে দেখি। শুধু তাই নয়, লেখক কাস্টম্‌সের লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে শারীরিক সক্ষমতার (লং-জাম্প, হাই-জাম্প, ট্রাক-রেস) পরীক্ষায় গিয়ে কী রকম অপদস্থ, অপমানিত হয়েছিল, তারও বিবরণ লেখক উপন্যাসে লিখেছেন। আসলে এই উপন্যাসে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর যৌবনের যে অংশে সংসারের কিছুটা আয় বাড়াতে বড়দার তাড়নায় চাকরিতে ঢোকার লড়াই করে যাচ্ছিলো, সেই অংশের লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে। এরই সঙ্গে তৎকালীন সময়ে (দেশভাগ পরবর্তী সময়) সরকারি চাকরির অবস্থা, বেকার যুবকদের কথা উঠে এসেছে। অবশ্য আজ একুশ শতকে জনসংখ্যার ভারে ক্লান্ত ভারতবর্ষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কিছুটা সহজ ছিল সেই সময় চাকরি পাবার সম্ভাবনা। তাই কাহিনিতে আসল রমেন ঘোষ একটা কাজ পেয়ে যায়। আমরা জানি, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বেলুড় ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টিল কোম্পানিতে (নিসকো) অ্যাসিস্ট্যান্ট স্মেলটার হিসাবে কাজে যোগদান করেন লেখক।

জীবনের এই সময় যখন চাকরি পাবার লড়াই চলছিল তখন লেখকের মনের অভ্যন্তরে আর এক ধরনের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল যা পরবর্তীকালে বনস্পতির আকার ধারণ করে। সেই বীজ হলো লেখক হবার মানসিক প্রক্রিয়া। এই পর্বের চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট রূপ আমরা পাই এই উপন্যাসে। জীবনের নানান ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৈশোর জীবনেই শ্যামলকে অপমানিত, অপদস্থ, ব্যর্থতা ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু পরিবারের লোকজনের আশা, ভরসা, বিশ্বাস, প্রত্যাশা ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য শ্যামলকে নানান রকম বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে

হত। তবে এই ধরনের কথা তো অনেকেই বলে। কিন্তু শ্যামল বুঝতে পারছিল তাঁর বানানো কথা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে অনেকেরই কাছে। ফলে এই রকম বানানো কথা বলা শ্যামলের কাছে নিয়মিত চর্চা হয়ে দাঁড়াল, ''একসময় অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল— হলেও হতে পারে ব্যাপার-স্যাপার গম্ভীর হয়ে বন্ধুদের বলে যাই— যদি দেখি ওরা তাতে মজে যাচ্ছে— তো সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম। লেখাটা পড়ে শোনালে কেউ কেউ বলতে লাগল— উ:, দারুণ! কেউ বা বলল—সাহিত্য!''[৩০] এই প্রক্রিয়ার কথাই তিনি বলেছেন 'অলীকবাবু' উপন্যাসে রমেন ঘোষের মধ্য দিয়ে। কীভাবে একজন লোফার বা লায়ার ধীরে ধীরে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হয়ে উঠল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও এরকম একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল যেখানে তিনি লায়ার থেকে লোফার, লোফার থেকে লুম্পেন হিসাবে বাকি জীবন কাটাতে হত। কিন্তু মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতাকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিণত করলেন। তবে শ্যামল বানিয়ে বানিয়ে বন্ধুদের সামনে যা বলত, তা সবটাই কাল্পনিক ঘটনা ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা হলেও হতে পারত এমন কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে বলত ও লিখত। এর ফলেই হয়তো অন্যের কাছে তা আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত। কারণ আমাদের শ্রবণে ও পাঠে নিজেদের কল্পনাও কিছুটা কাজ করে। আর লেখক সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বাস্তবতার সঙ্গে পরিমাণ মতো কল্পনা মেশানোর দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। লেখকের মতে যা 'কেলাসিত সত্য'। উপন্যাসে শ্যামল বলেছেন, ''আরেকটা জিনিস পরিষ্কার হল— সে এমন কিছু জিনিস দেখতে পায়— যা আর কেউ পায় না। অনেক পরে বুঝেছিল— এই পুরো ব্যাপারটার নাম হল— দৃষ্টিভঙ্গি। বা দেখার চোখ। একই পৃথিবী সবার চোখের সামনে। লেভেল ক্রসিং। হিমসাগরের ডাঁই। পাকা কাঁঠাল। লোকাল ট্রেন। রিকশা সাইকেলের প্যাঁক প্যাঁক। পায়ে পায়ে বর্ষাকালের জলকাদা। এর ভেতরেও মানুষের একটা রূপ ফুটে ওঠে। ... দেখতে জানলেই দেখা যায়। এই দেখা কেউ শেখায় না। দেখতে দেখতে শেখা। জীবন হতে হতে জানা।''[৩১] লেখক হিসাবে পরবর্তীকালে বনস্পতি হবার ইঙ্গিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের এই পর্বে ও 'অলীকবাবু' উপন্যাসে রমেন ঘোষের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে পেয়ে যাই। কীভাবে ''ওভারল্যাপিং সীমান্তে সাবধানে দাঁড়িয়ে একজন হয়ে যায় লেখক— অথচ একই ধাঁচের আরেকজন হয়ে যায় লোফার, লায়ার, লুম্পেন। একজন আরেকজনের পরিপূরক। কিংবা আয়নার প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আসলের আইডেনটিটি ক্রাইসিস।''[৩২] লেখক হয়ে ওঠা শ্যামল (উপন্যাসে লেখক চরিত্র রমেন ঘোষ) এবং সম্ভাব্য লুম্পেন হয়ে ওঠা (হলেও হতে

পারত) শ্যামল (উপন্যাসে অলীক রমেন ঘোষ)— এই দু'জনের কাহিনি নিয়ে নির্মিত উপন্যাসটি। এভাবেই তিনি লেখক রমেন ঘোষের মধ্য দিয়ে লেখক হবার মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করে অন্যান্য লেখকদের লেখক হবার প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ ঐতিহ্য তুলে ধরেন। কারণ, আসল কথা হলো পাঠকের কাছে নিজের কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা। তাহলেই পাঠক নিজের কল্পনার সহযোগে কাহিনির সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে। সেখানেই একজন লেখকের লেখক হিসাবে সিদ্ধি। তাই আমরা বলতেই পারি এটাই লেখক হবার প্রক্রিয়ার সাধারণ সনাতন ঐতিহ্য।

এই লেখক হবার প্রক্রিয়ার যাত্রাপথে নানান রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যার মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা জীবনের অন্ধকার দিকগুলোর বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছিল লেখককে যৌবনের প্রথম পর্বেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্কুল কোড বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ছাত্র-রাজনীতি করার অপরাধে (বামপন্থী ছাত্র সংগঠন) ১৯৫১ সালে কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হয় শ্যামলকে। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ এবং সেই পর্বের পাট চুকিয়ে পুনরায় ১৯৫৪ সালে চারুচন্দ্র কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়া। বাইশ বছর বয়সে ট্রাম ভাড়া, কলেজের মাইনে ইত্যাদির জন্য টাকা নিতে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। তাই টিউশানি জোগাড় করতে হয়। এই সময় সদ্য খোলা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে লেখকের যাতায়াত ছিল। সেই সময়কার ন্যাশনাল লাইব্রেরি সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন, ''পড়ার লম্বা হলঘরটার কাচের বাক্সে বিশেষ বই বা পাণ্ডুলিপি রাখা হোত। বিশেষ করে যেদিন কোন বিদেশী অতিথি আসতেন— সেদিন সেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা বই ওই কাচের বাক্সে থাকত। তাছাড়াও সেদিন ওইসব দামী বই কাচের বাক্সের কাছে টেবিলে খুলে রাখা হত— যেন কেউ পড়তে পড়তে এই মাত্র জল খেতে উঠে গেছেন। বিদেশী অতিথি এই দৃশ্য দেখে পুলকিত হতেন।''[৩৩] এই লাইব্রেরির বারান্দাতেই লেখকের সঙ্গে দেখা হয় স্কুলফ্রেন্ড মনোজ ঘোষের। মনোজ ঘোষ ও তার পরিবারের মধ্য দিয়ে শ্যামল অভিজ্ঞতা লাভ করে জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে এবং ঘুষখোর পুলিশের জীবনযাত্রা বিষয়ে। আবার তৎকালীন সমাজ, সময়ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে।

'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে মনোজ হয়েছে 'পার্থসারথি দত্তগুপ্ত' ও লেখক নাম নিয়েছেন 'খোকন।' পার্থসারথির জীবনে অন্ধকার এসেছে দু'রকমের। একটা অন্ধকার কিছুটা হাল্‌কা ও ফ্যাকাশে। যেখানে মানুষ নিজের পরিচিতি একেবারে ভুলে যায় না। কিন্তু অন্য অন্ধকার হলো গাঢ়

ও গভীর। যেখানে মানুষ নিজের পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। তখন জীবন যেন হয় অনেকটা যন্ত্রচালিত রোবটের মত। পার্থসারথির জীবন এই দুই ধরনের অন্ধকারের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল জীবন থেকেই একটু একটু করে খারাপ হতে শুরু করে পার্থ। বিশ শতকের ষাটের দশকে ভারতে প্রথম নিরোধ তৈরি করা হয় জনসচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য। তারপর সেটা বাজারে ছাড়া হয়। ভারত সরকার ১৯৫০ সালেই 'জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা' কর্মসূচি গ্রহণ করলেও নিরোধ নিয়ে আসত বিদেশ থেকে। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয় না। তাই সুলভ মূল্যে নিরোধ সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৬ সালে কেরলের 'হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স লিমিটেড' কোম্পানি থেকে নিরোধ উৎপাদনের কাজ শুরু করে। এই কাজ ভারত সরকারের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ' মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষণে শুরু করা হয়। আর ১৯৬৯ খ্রি: জাপানের ওকামোটো ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় ভারতবর্ষে বাণিজ্যিকভাবে নিরোধের উৎপাদন শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজারে চারের দশক থেকেই নিরোধ উপলব্ধ ছিল। পার্থ জানাচ্ছে, ''আমি চিরকালই সাবধানী। বিবিধ ভারতী তখনো নিরোধের গানটা ধরেনি। আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কিশোর। আমেরিকান সোলজারদের কৃপায় জিনিসটা পানের দোকানে এসে যায়।''[৩৪] পার্থসারথির বাবা নিত্যানন্দ দত্তগুপ্ত। স্বাধীনতার পূর্বেই কনস্টেবল হয়ে পুলিশের চাকরিতে যোগদান। তারপর যত দিন গিয়েছে প্রোমোশন পেয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ঘুষ নেওয়ার পরিমাণও লাগামছাড়া হয়ে যায়। ফলশ্রুতি নিত্যানন্দের পেছনে ভিজিল্যান্স লাগা— হাতেনাতে ধরা পড়া— চাকরি থেকে সাসপেন্ড। নিজের কেস পুলিশ কোর্টে লড়তে গিয়ে তিনি দেখলেন, তার মত অসংখ্য পুলিশ রয়েছে। আইন ও আইনের ফাঁকফোকর ভালো জানতেন জন্যে তিনি অনেকের আনঅফিসিয়াল উকিল হয়ে গেলেন। দারোগা থেকে ইন্সপেক্টর সবাই আসতে লাগল পার্থর বাবার কাছে। সাসপেন্ড— প্রোমোশন— বেআইনি প্রোমোশন ইত্যাদি নানান সমস্যা নিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত পুলিশ নিত্যানন্দ দাশগুপ্তের দ্বারস্থ হতে শুরু করে। এই কাজে নিত্যানন্দ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে দু'জন টাইপিস্ট, সর্বক্ষণের জন্য কাজে রাখতে হয়। নিত্যানন্দ নিচু স্তর (কনস্টেবল) থেকে উঁচু স্তর (এস.পি.) উন্নীত হয়েছিল— তাই এই যাত্রাপথের নানান ফাঁক-ফোকর, আলো-অন্ধকার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল পার্থর বাবার। আর তাছাড়া নিত্যানন্দ ঘুষ খেতে লজ্জা পেত না। ফলে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখান আইনের চোখে অভিযুক্ত নিত্যানন্দ হিরো হয়ে উঠল। এই নিত্যানন্দ

চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশি ব্যবস্থা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। আইনের রক্ষক হয়ে আইনকে কাজে লাগিয়ে নিজের আখের গোছানো নীতিহীন কাজ করা— এই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন বৃহৎ সংখ্যক পুলিশ আগাগোড়াই পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় ছিল। তার ফলেই হয়তো ধীরে ধীরে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস কমতে শুরু করে পুলিশি ব্যবস্থার ওপর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি উপন্যাস 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে কাশীপুর অঞ্চলের থানা, পুলিশ ও মানুষজন উঠে আসে। এই উপন্যাসেও যতীন দারোগার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পুলিশি সমাজ ব্যবস্থার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি ছেড়ে যখন তৎকালীন আর.এস.পি.-র পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশীপুরের একটি সরকারি আবাসনে উঠে আসেন লেখক তখন 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসটি লেখেন।

শুধু পার্থসারথি নয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই অনেক চরিত্রকে দেখি তারা ঘোড়ার রেসে টাকা লাগায়। কলকাতার নগরজীবনে তৎকালীন সময়ে এই জুয়া খেলা যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো এবং প্রায় সর্বস্তরের মানুষই এই জুয়াতে টাকা লাগাতে পারত। ঘোড়ার রেস ভারতে জনপ্রিয় হবার মূলে ছিল ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। যেমন, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি। বাংলায় ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিনোদনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ঘোড়ার দৌড় আয়োজন করা হয়েছিলো। তবে ১৮৬০ খ্রি: থেকে কলকাতায় লর্ড উলরিখ ব্রাউনের উদ্যোগে ঘোড়ার দৌড় অন্য মাত্রা লাভ করে। প্রথম দিকে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণির কাছে ঘোড়ার দৌড় জনপ্রিয় থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে ঘোড়ার দৌড় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে কলকাতায়। এই কলকাতাতেই এশিয়ার বৃহত্তম রেস কোর্স তৈরি করা হয় ১৮২০ খ্রি:। 'রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব' রেস কোর্সের দায়িত্বে আজ পর্যন্ত রয়েছে। ঘোড়ার রেস জনপ্রিয় হবার ফলে 'জকি' হওয়া একটা লোভনীয় কেরিয়ার ছিল তখন অনেকের কাছে। শ্যামলের নিজের বড়দা ঘোড়ার রেসে আগ্রহী ছিলেন এবং আমরা তো জানি, তিনি নিজেও একসময় চেয়েছিলেন শ্যামল 'জকি' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। বন্ধু মনোজের মধ্য দিয়ে শ্যামলের পরিচয় হয় মনোজদের বাড়িতে আশ্রিতা এক মাসীর সঙ্গে। এই পরিচয় শ্যামলকে জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেয়। তন্ত্র-সাধনা সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা লাভ করেন লেখক মনোজ ও মাসীর সূত্রে। লেখক বলেছেন,

''মাসীর ক্রিয়ায় বসাটা খোলসা হয়েছিল আমার কাছে আরও পরে। তখন মনোজ আরও ছন্নছাড়া। আরও ছিবড়ে। তখনই জানলাম— মানুষ মানুষকে খায়। খেয়ে শাঁস মজ্জা শুষে নিয়ে মাড়াই-আখ করে ফেলে দেয়। তখন সে স্রেফ জ্বালানি।

এইসব দেখে দেখেই কি আমি জীবনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি? আর তো তেমন স্বাদ পাই না! কোথায় যেন বিস্মিত হবার ক্যামেরাটা হারিয়ে ফেলে বসে আছি! কোন এক যাত্রা-পালায় হিরোইনের গান শুনেছিলাম— ''আমার কানের পাশা হারিয়ে গেল ওই ডোবায়—''[৩৫] এই মাসীর সমস্ত কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। সঙ্গে রয়েছে তন্ত্র-সাধনার নানান বিষয়। যৌবনেই একটি পরিবারের চূড়ান্ত ভরাডুবি ও তন্ত্র-সাধনার অন্ধকারের সম্মুখীন হওয়ায় লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, বৈচিত্র্যময় হয়েছে। কিন্তু লেখক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য হারানোর পর খুঁজে পাবার আনন্দ তো অনেক গুণ বেশি, তখন সেই জিনিসটার মূল্য আরও বেড়ে যায়। সময়ের স্রোত লেখককে বুঝিয়ে দেয় জীবন এই রকম। তাই পুনরায় যখন আগ্রহ-উদ্দীপনা ফিরে আসে তখন তা ক্রমশ বর্ধমান ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারই প্রতিফলন দেখি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে, তার জীবনদর্শনে। এভাবেই মানুষ বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায়। শুধু জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের প্রতি মুখ করে। আর শ্যামল সেগুলো নুড়ি পাথরের মত সংগ্রহ করে নিজের অভিজ্ঞতার কোঁচড় ভরাচ্ছিল যা পরবর্তীকালে লেখকের রচনায় মণি-মুক্তোর মত উঠে এসেছে। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি সময়-সমাজকে দেখার একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আগে থেকেই ক্রীয়াশীল ছিল লেখকের মধ্যে।

লেখক ঔপন্যাসিক বীক্ষায় এই পৃথিবীর পাল্টে যাওয়া সময়কে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রামধনু রঙের এই পৃথিবীর নানা বর্ণচ্ছটায় লেখক বিস্মিত হচ্ছিলেন। আর উপলব্ধি করেছিলেন, কোনও কিছুর জন্য সময় থেমে থাকে না। কারণ সময় ও জীবন সর্বদা গতিশীল। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে যে যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নিজের জন্মভিটা ছাড়তে হয়েছিল, সেই যন্ত্রণার উপশম হয়তো কোনও দিন হয়নি লেখকের। তবে দেশ ছাড়ার পঁচিশ বছর পরে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণে যান শ্যামল সেই যন্ত্রণায় মলম লাগাতে। লেখক বলেছেন, ''সেই যে চলে আসি ছেলেবেলার শহর পেছনে ফেলে— তার ছবি সবসময় মনে ভাসত। ছবিটা আসলে কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনের ভেতর। সেই কাঁটা তুললাম ঠিক তার পঁচিশ বছর পরে। তখন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে ছোটবেলার শহরে ঢুকে দেখি কিছুই চেনা যায় না।"[৩৬] দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা দুই বাংলাতেই জনবিন্যাস, জীবন-যাপন, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস ইত্যাদি সবকিছুর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখক যেহেতু কিশোর বয়সে দেশভাগের সময় এপার বাংলায় চলে আসে, ফলে বুকে যন্ত্রণা ও চোখে বিস্ময় ভরে বদলে যাওয়া সময়-সমাজকে নিরীক্ষণ করেছিল, ''কত জলা জমি— কচুরি পানায় ঢাকা পুকুর আজ জনপদ। বাঁশবাগান, শ্মশান, পোড়ো বাড়ি, ধোপার মাঠ, বাগানবাড়ি, ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুরে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় মানুষের দল দফায় দফায় এসে হাজির হয়েছে। তখন প্রায়ই গুলি চলত। কত লোকের টি.বি. হল। কত মেয়ে আস্তে আস্তে মেয়েমানুষ হয়ে গেল। কত ছেলে পকেটমার। পশ্চিম বাংলার মাঠে মাঠে এরাই এসে পাঠ চাষ শুরু করে দিল। এরা সংখ্যায় এত এল যে, একদিকটার বাংলা ভাষাই পাল্টে গেল। বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা অন্যরকম হয়ে গেল। কত স্কুল কলেজ গড়ে উঠল। রাস্তা হল। ইলেকট্রিক গেল। নতুন রেল স্টেশন জন্মালো। পিয়ারডোবা, গোদা পিয়াসাল, বাছুরডোবা, মানা, দণ্ডক, চান্দা জেলায়— দূর দূর জায়গায় খড়ের ছাউনি, নতুন বসানো টিউবয়েলের জল সম্বল করে নতুন নতুন জনবসতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা হল।"[৩৭] শ্যামলের বাবা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবসর নেন দেশভাগের মুখে। তবে তার আগেই কলকাতায় শ্যামলের বড়দা সুখেন্দুবিকাশ ও মেজদা জ্ঞানেন্দুবিকাশ চাকরি পেয়ে যায়। ফলে শ্যামলদের কোনও উদ্বাস্তু শিবিরে (যেমন— তাহেরপুর কিংবা কুপার্স ইত্যাদি) লাইনে দাঁড়িয়ে সরকারি ডোল নিতে হয়নি। তবে শ্যামলের বাবা মতিলাল ও মা কিরণময়ীকে প্রথম পর্বে ঢাকার বাংলাবাজারে নতুন জীবন শুরু করার পর (মতিলালের বয়স তখন ২৭ বছর) দ্বিতীয় পর্বে চুয়ান্ন বছর বয়সে কলকাতার এক বাসাবাড়িতে নতুন জীবন শুরু করতে হয়। জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই হয়তো ওপার বাংলাকে উদ্বাস্তুরা সর্বদা পূর্ব বাংলা বলে এসেছে। আর এই ভালোবাসাই মনে হয় প্রভাব ফেলেছে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর নামকরণে।

'ফিরোজা' উপন্যাসে লেখকের ভাবনা-চিন্তা- অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করেছে 'খোকন' চরিত্রটি। আর 'লুৎফর' চরিত্রে ছায়া রয়েছে শ্যামলের একদা স্কুলের বন্ধু ফেরদৌসের। উপন্যাসের কাহিনি অবশ্যই কাল্পনিক কিন্তু তৎকালীন সময়ে দুই বাংলার ছবি ও দেশভাগ সম্পর্কিত নানান ভাবনা শ্যামলের দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও ৭২ সালে বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসূত। ফলে দুই বাংলার অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। বাকিটা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কাহিনিকে

সাহিত্যে উত্তীর্ণ করা। আমরা এখানে কিছু ছবি ও ভাবনা কোটেশনের আকারে তুলে ধরব যা দুই বাংলাকে বুঝতে খানিকটা সাহায্য করবে—

ক. ''গত পঁচিশ বছরে আমরা রেল লাইনের দু'ধারের জলা জমি, পোড়ো মাঠে বসতি বসিয়েছি, রাস্তা করেছি, আলো এনেছি, স্কুল কলেজ করেছি। এই কলকাতার অনেক জায়গায় আমরাই ফেরিওয়ালা, আমরাই খদ্দের, আমরাই দোকানি, আমরাই মুটে, আমরাই ছাত্র।" [পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বাসস্থান/'ফিরোজা', পৃ. ১৬৮]

খ. ''বেগার খাটিয়ে দ্যাখ লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি কাটিয়ে বাংকার বানিয়েছিল শালারা। একটা লোককেও পয়সা দেয়নি নিশ্চয়। খাতায় মজুরি লিখে সব টাকা নিজের নামে করাচি কিংবা লাহোরে ব্যাংকে জমা পাঠিয়েছে। দেশে ফিরে সুখ করবে ভেবেছিল।" [পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধকালীন অবস্থা/'ফিরোজা', পৃ. ১৬৯]

পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় শেষদিকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদানের জন্য তখন পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করা পূর্ব পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়াররা নির্বিশেষে খুন করতেন না। মাথা পিছু কিছু টাকা আদায় করে ভারতে চলে যেতে বলতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম সমর্থক ছিল বিহারি মুসলিম মানুষ। তাদের হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানেই গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা। তবে এমন অনেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মানুষও ছিলেন যারা প্রাণ ভয়ে রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিল। এরাই অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করত। হার নিশ্চিত জেনে শেষদিকে পাকিস্তানী সোলজাররা আরও বেশি অমানবিক ও নির্মম হয়ে ওঠে। মেশিন দিয়ে কেমিক্যালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে পাড়ার পর পাড়া আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। নতুন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর নবগঠিত সরকারের একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আর্মস ফিরিয়ে নেওয়া। লেখক 'ফিরোজা' উপন্যাসে দেখাচ্ছেন, ''চায়ের দোকানে ছেলেরা চা খাচ্ছে, গুলতানি করছে, গালে দাড়ি, পিঠে তাদের সাবমেশিনগান। রাস্তা দিয়ে দশ চাকার লরি বোঝাই হয়ে ছেলেরা ফিরছে। লরির মাথায় মুজিবর রহমান আর ইন্দিরা গান্ধীর ছবি। ... শহরটা নাকি এখন মেজর জলিলের হাতে। খালিসপুর আর ফেরিঘাটে বিহারীদের একত্র করে পাহারায় রেখেছে ইণ্ডিয়ান আর্মির বিগ্রেডিয়ার জেইল সিংহের সোলজাররা।"[৩৮]

স্মৃতি আকুলতা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪৩ খ্রি: কাননবালা দেবী অভিনীত চলচ্চিত্র 'যোগাযোগ' খুলনার মায়ের (লেখকের তৎকালীন বয়স অনুসারে) বয়সী মহিলাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে কাননবালা দেবী ব্যবহৃত ঘটি হাতা ব্লাউজ। লেখকের স্মৃতির দুয়ারে খুলনার 'উল্লাসিনী' সিনেমা হলের থেকে 'যোগাযোগ' দেখে ফেরা মহিলাদের ঘটি হাতা ব্লাউজ পরার প্রবণতা ভেসে ওঠে। লেখকের নিজের মা কিরণকুমারী দেবীও সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে ভালোবাসাতেন। সার্কাস সেই সময়কার জনজীবনে অন্যতম একটি বিনোদনের (বিশেষ করে বাচ্চাদের) বিষয় ছিল। লেখক স্পষ্ট মনে করতে পারতেন তাদের শহরে (খুলনা) সার্কাস এলে ডিট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগত। না হলে গরীব মানুষেরা ঘটি, বাটি, থালা ইত্যাদি বন্ধক রেখেও সার্কাস দেখতে যাবে। ফলে গরীব মানুষ সাময়িক বিনোদনের জন্য আরও গরীব হয়ে যাবে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে এই রকমের সতর্কতা গ্রহণ করা হতো। লেখকের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ও অব্যবহিত পরের ঘটনাক্রমও রয়েছে। সেই বিষয়টি স্মৃতির সঙ্গে লেখকের বড় বেলার যুক্তি-বুদ্ধি মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে—''রবীন্দ্রনাথ মারা গিয়েছেন শুনে হেডস্যার স্কুলে ছুটি দিয়েছিলেন। ... ক্যালেণ্ডার কোম্পানিগুলো সে বছর অসংখ্য দাড়িওয়ালা ছবি ছেপে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাটারি, আলতার অ্যাভারটাইজমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে পিপল্‌স পোয়েট করে দিল দু'মাসের ভেতর। কলকাতার বাইরে তো সে আমলে এত রবীন্দ্রজয়ন্তী ছিল না— রবীন্দ্রসংগীতও এত যত্রতত্র শুনতে পাওয়া যেত না সে সময়ে। নাইন্টিন ফর্টিওয়ান টু-তে রবীন্দ্রনাথকে ছড়িয়ে দেবার মূলে ছিল এইসব ক্যালেণ্ডার— কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত।''[৩৯]

এভাবেই পুরো উপন্যাস জুড়ে নানান টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। ১৯৭২ সালে যখন শ্যামল সোলজারদের গাড়িতে চড়ে নিজের জন্মভূমি খুলনা শহরে পৌঁছান তখন 'স্মৃতিক্লিষ্ট', 'শৈশব ভারাক্রান্ত' হয়ে ওঠেন লেখক। পুনরায় নিজের জায়গা, পরিবেশ, দাপিয়ে বেড়ানো শৈশব-কৈশোরের (প্রথম পর্ব) ক্ষেত্রগুলো দেখে নস্টালজিয়ায় ভুগতে থাকেন লেখক। পঁচিশ বছর ধরে যে ধারণা-ভাবনার জন্ম হয়েছে— তা স্মৃতি খুটে খুটে দেখতে থাকেন। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পাতাতে তার নিদর্শন ছড়ান। দেশভাগ বিষয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া বিষয়ে ও ধর্ম বিষয়েও এখানে লেখক তাঁর ভাবনা-বিশ্বাস খোকন চরিত্রের মাধ্যমে অকপটে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে কোনও শূন্যস্থান থাকতে পারে না। ১৯৪৭-এর

দেশভাগের পর বৃহৎ সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা-ভিটেমাটি ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসার ফলে ওপার বাংলায় একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। ওপার বাংলার অনেক মানুষই সেই সুযোগটা গ্রহণ করে। ফলে একটা নবীন তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের জনগণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বড় সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়ার মত। কারণ লেখক মনে করেন, যে কোনও দেশের পক্ষে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের যে কোনও সমস্যা, প্রতিবাদ, আন্দোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার জন্য দরকার হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে কোনও দেশ বা জাতির ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড স্বরূপ। বয়েস নবীন, তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি হবার জন্য নবগঠিত বাংলাদেশের সামনে আরও উন্নতি, বিকাশের অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর ইতিহাস সাক্ষী, বর্তমান বাংলাদেশের গ্রোথ রেট তৃতীয় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এভাবেই লেখক সময়ের একটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আর শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভাবেই হয়তো পাকিস্তানে বারবার মিলিটারি শাসন কায়েম হয়েছে কিংবা একুশ শতকে এসেও পাকিস্তান দেউলিয়া হবার পথে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবন সম্পর্কে বরাবর অকপট। নিজের প্রিয়জন সম্পর্কেও, নিজের প্রিয়জনের কাছেও। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইতি সান্যালের সঙ্গে বিয়ে হবার একত্রিশ বছর পরে একটি মেয়ে আসে লেখকের জীবনে। ষাট বছর বয়সের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লেখকের অনুভূতির জগতে মেয়েটি তীব্র আলোড়ন ফেলে দেয়, ''... প্রায় ৩০/৩৫ বছর কেউ আর আমাকে নাম ধরে ডাকে না। কাকা— না হয় দাদা— কিম্বা জেঠু অথবা দাদু বলে সবাই। ও এসেই বলল— 'শ্যামল, দেখে হাঁটো, আছাড় খাবে।' শুধু শ্যামল বলায় এত ভালো লাগল কী বলব। আমিও তাকে বললাম, 'সাবধান।''[৪০] ইতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতানুসারে শ্যামল যখন ব্রহ্মপুরের বাড়িতে বসে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' লিখছিলেন, তখন এই মুগ্ধ পাঠিকার আবির্ভাব। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ''সেই মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে শ্যামলের সম্পর্ক গ্রন্থাগারের বই, মোঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে জোগাড় করা তথ্য এবং আরও অনেক কিছু পেরিয়ে এক অন্য নিবিষ্টতায় পৌঁছল। যাকে এক অর্থে বলে প্রেম।''[৪১] এই সম্পর্ক শ্যামলের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ও মানসিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার একটা কারণ ছিল শ্যামলের কোনও বিষয়েই সেরকম কোনও লুকোছাপা কোনও দিন ছিল না। মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অকপট। শ্যামলের জীবনে এই সম্পর্কের গুরুত্ব এই বিষয় থেকেও অনুমান

করা যায় যে, ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা (আমৃত্যু পর্যন্ত) বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এই মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্ক বিভিন্ন রূপে লেখকের কলমে বারবার উঠে এসেছে। আমরা এখানে এরকম কিছু উপন্যাসের কথা তুলে ধরছি। 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) উপন্যাসে শাহজাদা দারাশুকোর সঙ্গে রানাদিলের সম্পর্ক, 'বাম অলিন্দ' (১৯৯০) উপন্যাসে এগজিকিউটিভ আর্কিটেক্ট রঘুনাথ সেনের সঙ্গে জয়শ্রী বসুর সম্পর্ক, 'তারসানাই' (১৯৯৩) উপন্যাসে এসরাজ শিল্পী সুধীর পালিতের সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্ক, 'অদৃশ্য ভূমিকম্প' (১৯৯৪) উপন্যাসে লেখক কনক পালিতের সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্ক, 'কন্দর্প দর্পণ' (১৯৯৪) উপন্যাসে 'হলিডে-ইন' হোটেলের মেশিন ঘরের অপারেটিং সুপার তুষার সরকারের সঙ্গে তপতী দত্তের সম্পর্ক, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' (১৯৯৭) উপন্যাসে লেখক সমরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ইরা দত্তের সম্পর্ক, 'সূর্যাস্তের আগে' (১৯৯৮) উপন্যাসে রিটায়ার্ড কাস্টম্‌স অফিসার নীলাম্বর হালদারের সঙ্গে মন্দিরার সম্পর্ক। 'ভোরবেলার ভালোবাসা' (১৯৯০) উপন্যাসে লেখক মাণিকলাল মিত্রের সঙ্গে জয়শ্রী পালিতের সম্পর্ক। এই উপন্যাসগুলোতে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে আমরা শ্যামল ও আর তাঁর সঙ্গে মুগ্ধ পাঠিকার সম্পর্কের প্রভাব দেখতে পাই। উপন্যাস আলাদা, প্রেক্ষাপট-পরিবেশ আলাদা, চরিত্র আলাদা কিন্তু উপরিউক্ত প্রতিটি সম্পর্কে কিছু সাধারণ ভাবনা, বিষয় ও বক্তব্য রয়েছে যার মধ্য থেকেই আমাদের মনে হয় প্রতিটি সম্পর্কই একটি সম্পর্কের অভিজ্ঞতারই রকমফের। আমরা যদি এখানে সম্পর্কগুলোর সাধারণ বক্তব্য-ভাবনা তুলে ধরি, তাহলে সেই সময়ে লেখকের মনোভাবের একটি লেখচিত্র পাওয়া যাবে। যথা—

ক. প্রতিটি সম্পর্কেই নায়ক চরিত্রের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। নায়িকা মেয়ের বয়সী বা তার থেকেও কম। নায়কের জীবনের প্রায় শেষ পর্বে নায়িকার আগমন ঘটে।

খ. নায়ক চরিত্র বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ক্লান্ত। বাবা, স্বামী, শ্বশুর, দাদু ইত্যাদি ভূমিকার বাইরে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে স্বতন্ত্র কোনও পরিচয় বিলুপ্তের পথে। ব্যক্তি মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের নিরিখে নিজের স্বপ্ন-সাধ আকাঙ্ক্ষাকে পরিমার্জিত-নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। ফলে নায়ক চরিত্রের অস্তিত্বের সংকটে ভোগা।

গ. ''হয়ত ওর ভেতর স্বামী বলতে যে-ছবিটা আছে— তাও আমি হয়ে উঠতে পারিনি ডাক্তার। কিন্তু ধরো— সন্ধ্যেবেলা জানতে চাইলাম— আজ কি খাবো রাতে? সঙ্গে সঙ্গে ওর জবাব— তুমি বলো। যা বলবে তাই হবে। একবার কি ও নিজে একটা মেনু করতে পারে না।

খাবার টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসলে মনে হয়— অপারেশন টেবিলের দু'দিকে দু'জন বসে আছি। আমি ফলি মাছ ডিসেক্ট করে কাঁটা বেছে চলেছি। ও ডাল ঢেলে ফেলে হিমোগ্লোবিন খুঁজে পাচ্ছে না।" [তারসানাই, পৃ. ৪০]

ঘ. জীবনের শেষ পর্বে এসে উপলব্ধি করা, সারাটা জীবন ধরে সংসারের শুধু চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। সংসারের যেখানে যেখানে গর্ত নজরে এসেছে, সেই প্রয়োজনের গর্ত বুজিয়ে এসেছে। সংসারে শুধু একজনের জন্য কিছু করা হয়নি। তা হলো সে নিজে। নিজেকে সংসারে মনে হয়েছে প্রয়োজন মেটানোর একটি যন্ত্র।

ঙ. "শিখা, আমি তোমাকে মহুয়াকে, তপতীকে— সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ তোমরা রাজি হলে না। অথচ আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারতাম। কোন অসুবিধে ছিল না। ... আমি একই সঙ্গে অনেককে ভালোবাসতে পারি। ভালোবাসতে চাই—" [কন্দর্প দর্পণ, পৃ. ১৩৪]

ছ. দুই নারীর মধ্যে একজন (স্ত্রী) ডিভোর্স দিতে রাজি নয় অন্যজন (প্রেমিকা) ডিভোর্স নেবার ওপর বেশি জোর দেয়— যাতে তারা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। এদিকে নায়কের মধ্যে এতদিনকার স্ত্রী-সংসারকে ছেড়ে আসার দ্বিধাগ্রস্ততা। এই দ্বিধা কাটানোর জন্য নায়কের অভিনব প্রস্তাব— তিনজনে মিলে একসঙ্গে থাকা। দুই নারীরই তীব্র প্রতিবাদসহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

এই ধরনের কিছু ভাবনা-বক্তব্য ছিল সেই সম্পর্কগুলোর সাধারণ যোগসূত্র। আসলে হয়তো শ্যামলের ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তথাকথিত একঘেয়েমি বাসা বেঁধেছিল। লেখা ও সংসার নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করার ফলে দাম্পত্য জীবনের একটা পর্বে শীতলতা এসে যায়। জীবনে এক ধরনের শূন্যতা, অভাববোধ অনেক অগে থেকেই হয়তো তৈরি হচ্ছিল— সেই মুগ্ধ পাঠিকা এসে সেটাকে জাগিয়ে তোলে। আর শ্যামল মানেই জীবনকে নানান ভাবে আস্বাদন করা। ফলে সম্পর্ক অতি সহজেই নিবিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা শ্যামলের ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের মানসিকতার একটা আভাস পাই। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই মনোভাব লেখকের দাম্পত্য জীবনের পুরো সত্য নয়। তবে এই সম্পর্ক যে শ্যামলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা বোঝা যায় এতগুলো উপন্যাসে সেই সম্পর্ককে নানান রূপে আঁকা। জমি, ফসল, গাড়ির নেশার মত এই সম্পর্কের নেশাও একদিন কেটে যায় শ্যামলের জীবন থেকে। স্ত্রী ইতি গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "আবার শ্যামলও ছিল ভেতরে ভেতরে পরিবারের

মধ্যে মজে থাকা একটি লোক। ঝড়ের মতো সেই মুগ্ধ পাঠিকা শ্যামলের জীবনে এলেও, চলে তাকে যেতেই হত, গেলও। কিন্তু ওই যে শ্যামলের কোনো গোপন ছিল না। ছিল শুধুমাত্র জীবন।"[৪২]

বিবাহিত জীবনের আগে ও পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বারবার প্রেমে পড়েছে। ছোটবেলার এক প্রেমিকার নাম ছিল রাণু। যাকে আমরা পাই 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে 'স্বাতী' নামে। 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে পাই 'রাধা' নামে। বিদেশে পড়াশোনা করা, শ্যামলকে 'শ্যামলু সোনা' (লিপস্টিক দিয়ে লেখা) বলে চিঠিতে সম্বোধন করা মীরা সরকার নামে মেয়েটিও বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে ('তুষারহরিণী', 'ব্রিজের ওপাশে', 'ফোয়ারার ওপারে', 'অরবিন্দবাবুর ডায়েরি এবং স্ত্রী' ইত্যাদি ছোটগল্প, 'বৃহন্নলা' উপন্যাস) উঠে এসেছে। বাল্যবন্ধু মনোজের বোন আশার প্রতি দুর্বলতা উঠে এসেছে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে। শ্যামলের নারী প্রেমের ঘটনা-প্রসঙ্গ আমরা আরও অনেক উপন্যাসে দেখতে পাই। যেমন— 'পরস্ত্রী', 'সরমা ও নীলকান্ত', 'সতী-অসতী', 'যতীন দারোগার বেদান্ত', 'নতুন নগরের চিন্ময়ী' , 'টানেলের ভেতরে ট্রেন', 'বড় হওয়ার আগে' ইত্যাদি উপন্যাস। অবশ্য এই বিষয়ে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ''বিয়ের আগে ও পরে আজীবন শ্যামলের কাছে ঘুরে ঘুরেই প্রেম এসেছে। শ্যামল অংশ নিয়েছে তাতে। মনে হয়, শুধু প্রেমের জন্যেই প্রেম করেনি শ্যামল। প্রেম ও সম্পর্কগুলো ধরা দিয়েছে লেখা হয়ে।"[৪৩] তবে 'শাহজাদা দারাশুকো' লেখার সময় যে 'মুগ্ধ পাঠিকা' শ্যামলের জীবনে এসেছিল সেটাই হয়তো বিবাহ বহির্ভূত শেষ নারীপ্রেম। অনেকেই মনে করেন লেখক 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সেই মেয়েটির নামেই। আর উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে, 'শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়/কল্যাণীয়াসু'। আর আমরা তো দেখেছি 'কল্যাণীয়াসু' শব্দটির প্রয়োগে শ্যামলের দ্বিধাবোধ 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসে ও এই ধরনের উপন্যাসগুলোতে।

গ্রন্থাকারে ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসটি দু'টি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, এই উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস'শাহজাদা দারাশুকো' (সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত) রচনার সময় লেখক-মানসিকতার খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। দুই, 'শাহজাদা দারাশুকো' লেখার সময়ই লেখকের জীবনে মুগ্ধ পাঠিকার আবির্ভাব ঘটে। সময়ের ব্যবধানে মুগ্ধ পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্কের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছবি 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসেই পাওয়া যায়।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জুবিলি পার্কের বাড়ি ছেড়ে লেখক ব্রহ্মপুরের সমীর রায়চৌধুরীর বাড়িতে

এসে ওঠেন। বাড়িটি সব দিক থেকে ভালো হওয়া সত্ত্বেও একটি বড় সমস্যা ছিল। সমস্যাটি হলো মশাদের ভয়ানক উপদ্রব। লেখক এই সমস্যার সমাধান করে এই ভাবে, ''আড়াইশ টাকা দিয়ে লোকাল লেপতোশকের দোকান থেকে একটা মশারি বানালাম। দশ ফুট বাই দশ ফুট বাই দশ ফুট। দিনের বেলায় সেই ঢাকা বারান্দায় মশারি টাঙিয়ে তার ভেতরে টেবিল-চেয়ার নিয়ে লিখতে বসি। খিদের জ্বালায় মশারা মশারির বাইরে গান গায়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে বলে বুড়োটা লিখতে বসেছে। দিনেরবেলায় মশারি টাঙিয়ে।''[৪৪] ব্রহ্মপুরের ভাড়া বাড়ির বৃহৎ মশারি টাঙানো বারান্দাতেই সৃষ্টি হয়েছিল 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি। অবশ্য আরও কিছু উপন্যাস এখানে রচিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য শ্যামলকে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই উপন্যাস লেখার আগে লেখার জন্য শ্যামলের পরিশ্রম ছিল মূলত কায়িক। নিজেকে সর্বদা অনিশ্চয়তা, বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া, নিজের জীবনচর্যা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, স্মৃতিচারণ এবং নিজের নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে লেখার বিষয়বস্তু উঠে আসত। কিন্তু 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসটি লেখার জন্য শ্যামলের পরিশ্রম ছিল মূলত বৌদ্ধিক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোঘল রাজবংশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, অধ্যাপকগণদের। আমন্ত্রিত মানুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক অমলেন্দু দে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন লেখক। বাড়ির বইয়ের তাক্ ভরে গিয়েছিল মোঘল রাজবংশের সময়কার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুস্তকে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক রেখে শিখতে হয়েছিল উর্দু ও ফারসি ভাষা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লেখার প্রেক্ষাপটে লেখকের কিছু ভাবনা তুলে ধরব 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাস অবলম্বনে—

ক. ''ভেবেছিলাম একটা পিরিয়ড নভেল লিখব। অনেকেই তো অনেক কাহিনী লেখে। কিন্তু চলে যাওয়া সময়ের মানুষগুলোকে ফের জ্যান্ত করে তোলায় একটা আনন্দ আছে।''[একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১৫৮]

খ. ''এক একসময় মনে হয়— এই বাতাসের ভেতরই মিশে আছে আঠেরশ বত্রিশ, সাতান্ন, তেষট্টি। উনিশশ ষোল, সাঁইত্রিশ, বিয়াল্লিশ। শুধু সন্না দিয়ে আলতো করে সময়ের পাতলা পর্দা তুলে ফেললেই সব বেরিয়ে পড়বে। তখনকার মানুষ জানত না এখন কী ঘটবে। আমি এখন যা ঘটছে— তা দেখতে পাচ্ছি। আমার আজকের এই দেখাটা তখনকার সময়ে তখনকার মানুষের ভাবনায় দেখাতে পারলেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভবিষ্যতের আগাম আভাস আঁকা যায়।'' [একটি

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ. ১৫৮]

ব্রহ্মপুরের ভাড়া বাড়ির মশারি ঢাকা বারান্দায় বসে সৃষ্টি করে চলেছেন মোঘল রাজবংশ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখকের মতে এই রচনা 'কুটির শিল্প'। বাইরে থেকে শুধু শিল্পের কাঁচামাল (তথ্য) এনে বাড়িতে বসেই বিভিন্ন তথ্য সহযোগে কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন আস্বাদময় সাহিত্য রচনা করেছেন লেখক। আর 'মুগ্ধ পাঠিকা' যার উপন্যাসের কাহিনিতে নাম 'ইরা', তিনি লাইব্রেরী থেকে নোট করে লেখকের তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। লেখক বলেছেন, ''... ইরা শিপ্রার ভালমন্দ উপন্যাসের দুই নায়িকার মুখে ভালমন্দ হয়ে বসে যেতে লাগল। এছাড়া আমি আর কোন রাস্তা পাচ্ছি না। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগের ভারতবর্ষের দুই ঐতিহাসিক নারী। তাদের মনের ভেতরটা আমি আজকের ইরা আর শিপ্রাকে দিয়ে গড়ে দিতে লাগলাম।"[৪৫] এই দুই নারীর মাঝখানে শাহজাদা দারাশুকোর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সাড়ে তিনশ বছর পরেকার সমরেন্দ্রনাথ বসুর (উপন্যাসের কাহিনিতে) ওরফে লেখকের জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা। তাই দারাশুকোর মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং মিশে গিয়েছেন, ''... দুই নারীর মাঝে ঐতিহাসিক পুরুষটির চোখে তার সাড়ে তিনশ বছর পরেকার সমরেন্দ্রনাথ বসুর জীবনের বিষাদ, আহ্লাদ, ক্ষোভ। তাই ওই কুটির শিল্পে আমি নিজেও কোথাও কোথাও রয়ে গেলাম।"[৪৬] এভাবেই লেখকের ভেতরে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। বাইরে থেকে লেখকের দৈনন্দিন জীবনচর্যা দেখলে মনে হবে, একজন বুড়ো মানুষের শেষ বয়সে এসে ভীমরতি হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে লেখক তাঁর মিশ্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের দৈনন্দিন জীবন-ভামা তুলে ধরেন। 'মুগ্ধ পাঠিকা'র সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের রসায়ন প্রভাব ফেলে দারাশুকো ও রানাদিলের সম্পর্কে। বানাদিল যেন হয়ে উঠেছে 'মুগ্ধ পাঠিকা' ওরফে ইরা-র (একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসের কাহিনিতে নাম দিয়েছেন লেখক) প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। লেখক বলেছেন, ''ইতিহাস থেকে একটা উপন্যাস আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। মরা স্যাটেলাইটে আজকের আকাশ ভর্তি। সেরকম একটা স্যাটেলাইট হয়ে পড়ে আছি। বইয়ের আণ্ডিলের ভেতর ডিকশনারি হয়ে বসে আছি। তার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে পুরুষ হয়ে উঠছি। প্রেমিক হয়ে উঠছি।"[৪৭] এখানে সমরেন্দ্রনাথ বসু আসলে লেখক স্বয়ং এবং 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে শাহজাদা দারার মধ্যে কোথাও কোথাও লেখক নিজেই অবস্থান করেছেন। অবশ্য আমরা তো জানি, সাহিত্যিক চরিত্র বাস্তব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু হুবহু অনুসরণ

প্রথম শ্রেণির সাহিত্যে সাহিত্যগত কারণেই সম্ভব নয়। আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রের ক্ষেত্রে তো বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হওয়াই সম্ভব নয়।

সাহিত্য-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখতে এই ধরনের নানান মানসিকতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল হয়তো লেখককে। অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাসের প্রসব যন্ত্রণা আমরা 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাস পাঠে কিছুটা অনুভব করতে পারি। লেখক বর্তমান সময়ের রাগ-ক্ষোভ, ভালোবাসা-অভিমান, জয়-পরাজয়, রাজনীতি-কূটনীতি ঐতিহাসিক পরিবেশে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক চরিত্রদের মধ্যে নিপুণ শিল্পীর মত বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই 'শাহজাদা দারাশুকো' পড়তে পড়তে সময়ের প্রবাহমানতা ও মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্তের আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। আর আমরা তো জানি, ''ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে চরণে মিল।''[৪৮] সময়-সমাজ তার চেহেরা বদলে ফেলে শুধু। এই অনুভবের ধারণা যেন পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চান লেখক।

ব্রহ্মপুরে আসার আগে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে টালিগঞ্জের জুবিলি পার্কের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন শ্যামল সপরিবারে প্রায় দু'বছর। এখানে পুনরায় শ্যামলের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শ্যামলের পা ভাঙে। আর্থিক ও শারীরিক— দু'টো দিক থেকেই কষ্টের সম্মুখীন হন লেখক। ঠিক এই সময় 'আলোকপাত' পত্রিকা থেকে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতোদিন শ্যামল গল্প ও উপন্যাসের আঙ্গিকে জীবন-অভিজ্ঞতা লিখে যাচ্ছিলেন। হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় একই রকম আঙ্গিকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে করতে এক ধরনের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। তাই 'আলোকপাত' পত্রিকাতেই শ্যামল প্রথম আঙ্গিক বদলে ফেললেন। ইতি গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ''তাই 'আলোকপাত'-এ ওর লেখা শুরু হল নিজের জীবনের কথা দিয়েই, তবে সেটি আর গল্প বা উপন্যাসের খাঁচায় আটকে রইল না। এই আত্মকথা হয়ে উঠল ওর জীবনের স্মৃতির জানালা। সেই জানালা দিয়ে নিজের অতীত সরাসরি আলোর মত এসে পড়ল 'জীবনরহস্য' লেখায়, যা ধারাবাহিকভাবে 'আলোকপাত'-এ বেরোতে শুরু করল।''[৪৯] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবনের প্রায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র এই 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই শ্যামলের সময়-সমাজ এবং উপন্যাসের সময়-সমাজ জানার জন্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যা লেখকের নিজের হাতে রচিত। এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয় বুঝে গেছে এই গবেষণাপত্রে বা বিশেষ করে এই অধ্যায়ে আমাদের মূল সহায়ক গ্রন্থ বা দিক নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে

‘জীবনরহস্য’ গ্রন্থটি কেন অবলম্বন করেছি। এই গ্রন্থটির আমরা পৃথক বিস্তৃত আলোচনা করছি না, কেন না, আমাদের এই গবেষণাপত্রে বা বিশেষ করে এই অধ্যায়ের আলোচনায় এই গ্রন্থটিরই বিভিন্ন অংশ কোট করা হয়েছে সময়-সমাজ-ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য। আর তাছাড়া ‘জীবনরহস্য’ গ্রন্থটি একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা, উপন্যাস নয়।

‘‘আঃ! মানুষ কেন অতদিন বাঁচে না? আমার তো ইচ্ছে করে কয়েকশো বছর ধরে বাঁচি। এই পৃথিবীর যত সুর আছে— তার ভেতর ছন্ন হয়ে ডুবে থাকি। এত রস। এত আনন্দ। মহানিম মাটির ভেতর থেকে— আলোর ভেতর থেকে রস-প্রাণ শুষে নিয়ে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।’’[৫০] জীবনরসে ডুবে থাকা মানুষ সুরের সাগরে ডুবে থাকতে চাইবে— এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ জীবনরসেরই তো একটি উপাদান সুর। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বরাবরই সুরপাগল এক মানুষ। তাঁর লেখার সময় গানের রেকর্ড বাজত, যেন গানের রেকর্ড শুনতে শুনতে প্রবেশ করত তারই সৃষ্ট জগতে। সুর ও গানের জগতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ক্লাসিক্যাল মিউজিক। বন্ধু অশেষ চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানান, ‘‘গানবাজনা শ্যামলকে টানত। তবে ভিন্টেজ ওয়াইনের মতো ভিন্টেজ গান। বিশেষ করে ঠুংরি, জদ্দনবাঈ বা জোহরাবাঈয়ের গান শুনতে ভালোবাসত। আর ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ সাহেব কিংবা ভীষ্মদেব। সব আটাত্তর আর.পি.এম-এর। ফুটপাথে অবহেলায় পড়ে থাকা খোসা ছাড়ানো ডাঁই করা রেকর্ড ঘেঁটে কেনা।’’[৫১] এছাড়াও গাঙ্গুবাঈ, গওহরজান, বেগম আখতার প্রিয় ছিল শ্যামলের। অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে কে.এল.সায়গল, রবীন মজুমদার, কাননদেবী, শচীনদেব বর্মন, অখিলবন্ধু ঘোষ, কিশোরকুমার, মহঃ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখর গান শুনতে বড় ভালোবাসতেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যে বিষয়টি ভালোবাসেন, তা তাঁর লেখায় উঠে আসবে না— এটা হতে পারে না। গান-সুর-রেকর্ড-বাদ্যযন্ত্র তাই বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে। তবে সেই সব উপন্যাসগুলোর মধ্যে হয়তো অন্যতম দুটি উপন্যাস হলো, ‘তারসানাই’ ও ‘মাতৃচরিতমানস’। এই দুটি উপন্যাসে এসরাজের প্রতি লেখকের বিশেষ দুর্বলতা দেখা যায়। হয়তো এই বাদ্যযন্ত্রটির সুর লেখকের মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নিজের শৈশব-কৈশোর পর্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একজায়গায় বলেছেন, ‘‘যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে— সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভালো ছোটবেলা আসলে বড়বেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট

হাতে থাকলে বড়বেলাটাও সুন্দর।"[৫২] আর সাহিত্য সৃষ্টি করা তো প্রতিভার নদীতে সাঁতার দেওয়া, যে কাজে শ্যামল অত্যন্ত সফল একজন মানুষ। তার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট, শ্যামলের পকেটে শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতার খনি থাকা। আসলে প্রতিটি মানুষের শৈশব-কৈশোরের পর্বে কিছু সাধারণ গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, অপার বিস্ময়, কল্পনাশক্তি, অন্তহীন কৌতূহলতা, পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, নতুন কিছু তৈরি করা, বানানোর অদম্য পরিকল্পনা, স্বপ্ন, পরিণাম অপেক্ষা কাজ করবার জেদি মানসিকতা, নিজেকে বারবার অনিশ্চয়তা ও বিপদের মুখে ঠেলে দিলেও মজা উপভোগ করার মানসিকতা, মুহূর্ত ধরে জীবন কাটানো ইত্যাদি। তবে সাধারণ বৃহৎ সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের স্রোতে বা ধাক্কায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভেসে যায় নয়তো ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। আর হয়নি বলেই পকেটে সমৃদ্ধ শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নিয়ে সহজেই সাহিত্য-প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে পেরেছেন। 'তলানিশুদ্ধ জীবনরসের নেশাড়ু শ্যামল'-এর বীজ লেখকের এই শৈশব-কৈশোর পর্বেই রোপিত হয়েছিল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার শৈশব-কৈশোর পর্ব সম্পর্কে আরও জানাচ্ছেন, ''আমরা ছিলাম দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানের রূপকথার জগতে। অন্তত এখনকার চোখে তাকালে তো তাই মনে হবে। মহাযুদ্ধ এসে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে এক অকল্পনীয় সব ব্যাপারের ভেতর টুপ করে ফেলে দিল। এখন যেমন ঘটনাই ঘটে না — তখন শুধু ঘটনার ভেতরই আমরা থাকতাম।"[৫৩] শুধু মহাযুদ্ধ নয়, আরও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে লেখকের কৈশোর পর্বে। যেমন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, শেকড় ছিড়ে উদ্বাস্তু হওয়া, পরিবেশ-পরিস্থিতি-আবহ দ্রুত গতিতে পাল্টে যাওয়া ইত্যাদি। ফলে সত্যি, লেখক ঘটনার ভেতরেই সর্বদা অবস্থান করত। এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় সব উপন্যাসে শৈশব-কৈশোর পর্বের ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র কোনও না কোনও ভাবে উপস্থিত হয়েছে। তবে মনে হয় লেখক জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে লেখা শেষ অন্যতম বৃহৎ (পৃষ্ঠা সংখ্যায়) উপন্যাস 'আলো নেই' (দু'খণ্ড)-এ অবিভক্ত ভারত তথা বঙ্গের বিশেষ করে খুলনার সময়-সমাজ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং লেখকের শৈশব-কৈশোর জীবনের ছবি এখানে দেখতে পাই। বা এভাবেও বলা যেতে পারে লেখকের শৈশব-কৈশোর পর্বের (দেশভাগের আগে) সবচেয়ে বেশি ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখকের জীবনের প্রায় অন্তিম পর্বে স্মৃতি-রোমন্থনের সাহায্যে 'আলো

নেই' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে বম্মাপুর পর্ব শেষ করে কয়েক মাসের জন্য ছিলেন কুঁদঘাটের একটি ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু বাড়ি পছন্দ না হওয়ায় শ্যামল পুনরায় চলে আসেন টালিগঞ্জের পুরানো ঠিকানায়। এখানেই তিনি লেখেন 'আলো নেই' উপন্যাসটি যার প্রথম খণ্ডটি তৎকালীন অপর্ণা সেন সম্পাদিত 'সানন্দা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখক তাঁর জীবনে দু'টি উপন্যাস লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করতে হয়েছিল। এক, 'শাহজাদা দারাশুকো' (দুই খণ্ড) উপন্যাস এবং দুই. 'আলো নেই' (দুই খণ্ড) উপন্যাস। দ্বিতীয় উপন্যাসটির জন্য দেশভাগ সম্পর্কিত বিষয়, তৎকালীন রাজনীতি, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি, নানান ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ভাবনা-চিন্তা, কর্মসূচী, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি, সাধারণ জনগণের সার্বিক চিন্তা-ভাবনা, জমিদার-মধ্যবিত্ত-ক্ষেত মজুরদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলাচলতা, কমিউনিস্ট চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত করার চেষ্টা, কৃষক-সংগঠন, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান মানসিকতা ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতে হয়েছিল লেখককে। এই ঐতিহাসিক কালখণ্ডের ছবি ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থনের সাহায্যে অবিভক্ত বঙ্গের খুলনায় কাটানো নিজের শৈশব-কৈশোর পর্বটিও জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি। ফলে তৎকালীন সময়-সমাজ- ঐতিহ্য বোঝার জন্য 'আলো নেই' উপন্যাসটি অন্যতম। এই উপন্যাসে অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবার আসলে লেখকের পরিবারকে প্রতিফলিত করেছে। লেখক টালিগঞ্জের ৭৯ দেশপ্রাণ রোডে 'ঘড়িঘর' নামক বাড়িতে বসে জীবন্ত করেছেন নিজের ছোটবেলাকে। ছোটবেলার দেখা-অনুভূতি-নানান কর্মকাণ্ড খুলনা শহরকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠতে থাকে 'আলো নেই' উপন্যাসে। লেখক যেন জীবন-আয়ুর সায়াহ্নে বসে সময়-পরিভ্রমণের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন জীবন-আয়ুর প্রভাতবেলায়। অনন্ত ঘোষাল ও অন্যান্য মানুষ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রের সঙ্গে লেখকের কল্পনাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি 'আলো নেই' উপন্যাসকে একটি শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছে। উপন্যাসটির সময়কাল হলো ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-রাষ্ট্রপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচিত হয়ে এই পদ থেকে ইস্তফা দেবার আগে পর্যন্ত। তাই বলা যায়, তিন-চার বছরের সময়সীমার কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের দু'খণ্ড মিলিয়ে। আমরা প্রথমে উল্লিখিত সময় পর্বের তথাকথিত নানান গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তৎকালীন সময়-সমাজ-পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করব। যথা—

ক. পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন মূল চালিকাশক্তি জাতীয় কংগ্রেস। না পূর্ণ স্বরাজ, না সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ বিরোধিতা, না দীর্ঘকাল ধরে জমিদারদের হাতে অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত গরীব কৃষকদের স্বার্থে কোনও ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা— কোনোটারই ক্ষেত্রে সেই সময় কোনও সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ তৎকালীন সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস। ফলে দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব, কর্মীদের মধ্যে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। পরপর দু'বার (হরিপুরা ও ত্রিপুরা) নির্বাচিত হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি-সভাপতি হিসাবে সুভাষ চন্দ্র বসু। কিন্তু তারপরেও তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ জাতীয় কংগ্রেসে মহাত্মাগান্ধী তখনও সর্বেসর্বা।

খ. যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে— সেই জায়গা ভরাট করতে উত্থান ঘটে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও মুসলীম লিগের। সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে ভারতের বাতাসে ছড়িয়ে দিতে থাকে শুধু অবিশ্বাস, ঘৃণা, প্রতিশোধের মানসিকতা। লেখক জানান, সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর চেয়েছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে। কিন্তু গান্ধিজী সুভাষের এই চরমপন্থী মানসিকতার সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। ফলে সুভাষের নেতৃত্বের সময় কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষপন্থী ও গান্ধীপন্থী-এই দুই মতাদর্শের সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সুভাষ চূড়ান্ত কঠোর অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্বলতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা, ভোটে জেতা আবুল কাশেম ফজলুল হকের সঙ্গে জোট বাঁধতে দেয় না। ফলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে লিগ। মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়ে মুসলীম লিগ আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে বাংলায়। অন্যদিকে মুসলীম লিগকে কাউন্টার করতে গিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার কমিউনিস্টসহ বামপন্থী দল তাদের সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি স্তরে পৌঁছানোর মত সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের পক্ষেও বাংলা তথা ভারতের মানুষকে একত্রিত করে বৃহৎ কোনও আন্দোলনে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই সব রাজনৈতিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র ছাড়াও লেখক সাহিত্য, থিয়েটার, গান, চলচ্চিত্র— এই সব জগত থেকেও নানান বিখ্যাত ঐতিহাসিক মানুষদের হাজির করিয়েছেন উপন্যাসের পাতায়। ফলে তৎকালীন সময়-সমাজ বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে। এই সব মানুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাশ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ। লেখকের মতে, এই পৃথিবীতে

একই সঙ্গে একই সময়ে নানান জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। মানুষ যেহেতু ত্রিকাল ও সবদর্শী নয়, সেহেতু মানুষের পরিচিত পরিধির মধ্যে যা ঘটে, বাস্তব মানুষ সেটুকুই জানতে পারে। কিন্তু লেখকের সৃষ্ট জগতে লেখক বাস্তব মানুষের এই ক্ষমতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে চেষ্টা করেছেন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে ঘটা ঘটনার একটি কোলাজ তৈরি করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে। যাতে তৎকালীন সময়-সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবারের ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা-অনুভূতির সাহায্যে তৎকালীন সময়-সমাজকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নানান ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্রদের ক্ষেত্রে লেখককে ইতিহাস বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে ও ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রের সহযোগিতা সেই সময়কে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কাল্পনিকতা। ফলে গ্রন্থটি নেহাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ না হয়ে ইতিহাস-আশ্রিত শিল্পসম্মত একটি উপন্যাস হয়ে উঠেছে। কিন্নর রায় বলেছেন, ''নিরাসক্ত ভাবে তিনি বাঙালি জাতির এই আলোবিহীন দুঃসময়কে তুলে এনেছেন তাঁর মতো করে। এমনকি যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির ব্যাপারে তিনি বেশ খানিকটা দুর্বল ও এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, সেই জাতীয় কংগ্রেসের সেই সময়কার ভূমিকাকে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে সমালোচনা করার ব্যাপারে পিছিয়ে যাননি।''[৫৪] কংগ্রেসের রাজনীতি বিষয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন, ১৯৩৭ সালের মার্চে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে যখন কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় জাতীয় কংগ্রেস। সেদিনই যেন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। বঙ্গবিভাগ হওয়া ছিল তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, অনন্ত ঘোষাল ও তার পরিবার লেখকের পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নির্মাণ করা। কোন কোন ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র লেখক বাস্তব ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার একটা ধারণা আমরা এখানে তুলে ধরব। যার মাধ্যমে খুলনা তথা বাংলার সময়-সমাজ সম্পর্কে একটি ধারণা আমরা পাব। যথা—

ক. সেসন জজের পেশকার অনন্ত ঘোষাল লেখকের বাবা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি দিয়ে নির্মিত। তেমনি স্ত্রী রত্না ও অনন্তর পাঁচ সন্তান লেখক তাঁর নিজের পরিবারের স্মৃতিকে মাথায় রেখেই তৈরি করেছেন। অবশ্য বাস্তবে লেখকরা ছয় ভাই ও এক বোন হলেও একমাত্র

বোন রমা ও সর্বকনিষ্ঠ ভাই তাপসের জন্ম ১৯৩৬ সালে হয়নি। আর বছর চারেকের খোকন ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া শ্যামলকেই ইঙ্গিত করে। উপন্যাসের খোকনের এক দাদা (পানু) জড়িয়ে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে— সেভাবে বাস্তব জীবনেও লেখকের এক দাদা (পুর্ণেন্দুবিকাশ) জড়িয়ে পড়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি ছিল বরিশালে। কর্মসূত্রে খুলনায় এসে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলেন। অনন্ত ঘোষালের ক্ষেত্রেও সেই কাহিনি আমরা দেখতে পাই।

খ. খুলনা শহর খুব বেশি প্রাচীন শহর নয়। ১৮৪২ সালে মহকুমা হিসাবে 'খুলনা'র জন্ম হয়। আর জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে। যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা ও চব্বিশ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে খুলনা জেলা নির্মাণ করা হয়। ইতিহাসে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে এই শহরে প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে। খুলনা শহর সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, ''যেভাবে একটি নগর গড়ে ওঠে— বসতি বেড়ে ওঠে— ঠিক সেইভাবেই এই খুলনা শহরের বাড়বাড়ন্ত। এই শহরে মাস্টার মশাই আছেন, জমিদার, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আছে আবার গাঁজা আফিমের দোকান আছে। বেশ্যালয় আছে। মদের দোকান আছে। মেথর পাড়াও আছে।" [আলো নেই', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯] বড় বড় চা-কোম্পানি চা-এর প্রচারের জন্য বা সাধারণ মানুষদের মধ্যে চা-এর নেশা ধরার জন্য এই সময় এক ধরনের প্রচার কৌশল অবলম্বন করেছিল। বাজার-হাট বা যেখানে সাধারণ লোকজনের ভিড় বেশি সেখানে তৎকালীন কোনও জনপ্রিয় গান বাজিয়ে (কল-রেকর্ড বাজিয়ে) একদম বিনামূল্যে চা বানিয়ে খাওয়ান। এই চিত্র আমরা এই উপন্যাসেও দেখতে পাই।

গ. কচ্ছপ ধরা বা খাওয়া তখনও ভারতে নিষিদ্ধ হয়নি। বাজারে মাছের মত কচ্ছপও উঠত। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় যে, শীতের বিকালে অনন্ত বাজার থেকে কচ্ছপ এনে কেটে দেন রত্নাকে। কচ্ছপের মাংস ভালো রাঁধতে পারেন রত্না।

ঘ. উপন্যাসে জমিদার কালিদাস ঘোষ বলছেন, ''দেখবে বেশিরভাগ বাড়ি উকিল নয়তো মোক্তারদের। মামলা মোকদ্দমায় আমরা শেষ। আর পয়সা গিয়ে উঠেছে উকিলের ঘরে। ওরা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। পলিটিক্স করছেন। পাকা বাড়ি করছেন। কংগ্রেস, লিগ— সব দলেরই তাবড় তাবড় নেতারা তো সবাই পেশায় উকিল।" ['আলো নেই', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩০] আসলে এখানে লেখক একটি বদলে যাওয়া সময়কে তুলে ধরেছেন। ইংরেজ শাসনের শেষদিকে (বিশ শতক)

আইনচর্চা তৎকালীন শিক্ষিত মানুষদের কাছে অন্যতম লোভনীয় কেরিয়ার হিসাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন বা পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে কিংবা জমি ছাড়া বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে না পেরে জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে। হয়তো সময়-সমাজ-পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি জমিদাররা কখনও ধরতে পারেনি বা ধরতে চায়নি। বাংলায় ফজলুল হকের উত্থান তো এই জমিদারদের বিরোধিতা করেই। তাই জন্য হয়ত গরীব হিন্দু-মুসলিম কৃষক ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সমর্থক ছিল।

আমরা খুলনা, কলকাতা, ভৈরব, রূপসাসহ বাংলার যে ছবি এই উপন্যাসের দু'টি খণ্ডে দেখতে পাই, তা আসলে লেখকের পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা। নিজস্ব স্মৃতি, দাদা-ভাইদের স্মৃতি, মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্প, বড় হয়ে বিভিন্ন বিষয় জেনে কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে তৎকালীন সময়-সমাজ তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই কিন্নর রায় যথার্থই লিখেছেন, ''আলো নেই' লিখতে গিয়েও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু সেই সময়ের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রদেরই ধরেননি। তিনি এইসব নামী দামীদের পাশাপাশি নেমে এসেছেন একদম প্রান্তিক মানুষের কাছাকাছি। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের ঘরের ভেতর।''[৫৫] উপন্যাসে উঠে আসে জমিদারের অবৈধ সন্তান কালোদা, ফোতোদা ও তাদের বিধবা বোন ফ্যাকাশি দাইয়ের কথা। উপন্যাসের দু'খণ্ড জুড়ে আরও অনেক ঘটনা-প্রসঙ্গ, চরিত্র আছে যা লেখকের বাস্তব জীবন থেকে গড়িয়ে উপন্যাসের পাতায় উঠে এসেছে। তাই সেই ঐতিহাসিক কালপর্বকে জানতে হলে, বুঝতে হলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলো নেই' উপন্যাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ৯

২. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ১৩

৩. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৭৯

৪. তদেব, পৃ ১৮০

৫. তদেব, পৃ. ১০

৬. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (দ্বিতীয় ভাগ), সম্পাদক-শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, ভাদ্র-১৩৫০, পৃ. দ্বিতীয় খণ্ডের ১।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়' রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৩৪

৮. তদেব, পৃ. ৪২৮

৯. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২৭

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ৭২

১১. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২৫

১২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮১

১৩. তদেব, পৃ. ১৮১

১৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৮৫

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৭

১৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৬

১৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮১

১৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৭

১৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অতি জীবিত শ্যামল', প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (পুনর্মুদ্রণ),

সংকলক-সমীর চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৫

২০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৯২

২১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২১৯

২২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী' রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৩৭

২৩. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৬১

২৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ১০৮

২৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২২১

২৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৩০৪

২৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮২

২৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অলীকবাবু', দশটি উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩২৯

২৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৪৮

৩০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১২২

৩১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অলীকবাবু', দশটি উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৩২

৩২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৬০

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪

৩৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'সিদ্ধকামিনী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১৬

৩৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৪৫

৩৬. তদেব, পৃ. ৯০

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'ফিরোজা', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১৬৬

৩৮. তদেব, পৃ. ১৮৩

৩৯. তদেব, পৃ. ১৯১

৪০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৬৭

৪১. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৯০-৯১

৪২. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৯১

৪৩. তদেব, পৃ. ১৯

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৩

৪৫. তদেব, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৪৬. তদেব, পৃ. ১৬৫

৪৭. তদেব, পৃ. ১৯৩

৪৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বাতায়নিকের পত্র', 'কালান্তর', রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৮৮০ শকাব্দ: ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

৪৯. গঙ্গোপাধ্যায় ইতি, ‘আমার শ্যামল’, অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৭৯-৮০

৫০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘তারসানাই’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

৫১. চট্টোপাধ্যায় অশেষ, ‘তলানিশুদ্ধু জীবনরসের নেশড়ু শ্যামল’ (পুনর্মুদ্রণ) ‘প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়’ সংকলক: সমীর চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৩১

৫২.গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘জীবনরহস্য’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ; পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৫৮

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৩

৫৪. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কথামুখ’, কিন্নর রায় লিখিত ভূমিকা অংশ, ‘আলো নেই’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৯।

৫৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, ‘কথামুখ’, কিন্নর রায় লিখিত ভূমিকা অংশ, ‘আলো নেই’, দ্বিতীয় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৯।